ড. হিশাম আল-আওয়াদি

বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ

অনুবাদ : মাসুদ শরীফ

বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ

ড. হিশাম আল আওয়াদি

অনুবাদক : মাসুদ শরীফ

সম্পাদনা

আবু সাঈদ আল-আযহারি	স্নাতক, ইসলামি শারি'আহ আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়।
নাজিম মাহমুদ	মোহাদ্দিস, জামিয়াতু আমিন মোহাম্মদ আল ইসলামিয়া, আশুলিয়া মডেল টাউন সাভার, ঢাকা।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

বাবা হারানো শিশুদের সামনে কখনো চার বছরের পিতৃহারা শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-কে দাঁড় করিয়েছেন? বাবা-মা হারানো এতিম শিশুর সাথে কখনো কি পাঁচ বছরের এতিম মুহাম্মাদ ﷺ-এর বন্ধুত্ব গড়ে দিতে পেরেছেন? আমাদের টিনএজ প্রজন্ম একুশ শতকের আজকের দিনে এসে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, কিশোর মুহাম্মাদ সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে ঠিক এমনই কিছু চ্যালেঞ্জ সামলিয়েছিলেন দারুণভাবে। তিনি তারুণ্যের সংকট মোকাবিলা করেছেন, তারুণ্যের রক্ত ও শক্তি পরিশীলিত সমাজ গঠনে কাজে লাগিয়েছেন। আজকের তরুণরা সেদিনের যুবক মুহাম্মাদকে পড়ে ইমপ্রেস না-হয়ে পারবেই না! নবুওয়াতের আগেই একজন ক্রিয়াশীল ইফেক্টিভ মানুষ হিসেবে সমাজে জায়গা করে নেওয়া মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ত্রিশের কোঠার টগবগে মানুষগুলোর রোল মডেল না-হয়ে কি পারে? নবুয়্যতের পরের নবিজি ﷺ-এর যাপিত জীবন, কর্মপদ্ধতি আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তো অতুলনীয়, অসাধারণ!

রাসূল ﷺ-এর জীবনকে নানাভাবে লেখা হয়েছে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব কুয়েতের প্রফেসর ড. হিশাম আল আওয়াদি তাঁর 'Muhammad: How He Can Make You Extra-Ordinary' বইয়ের মাধ্যমে এক নতুন ধারায় রাসূল ﷺ-কে উপস্থাপন করেছেন। বইটির মাধ্যমে শৈশবের নবিজিকে দেখিয়ে শিশুদের করণীয় খুঁজে দিতে পারবেন, বাবা-মা তার সন্তানকে প্রতিপালনের ধারণা নিতে পারবেন, তরুণরা তাদের আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপাত্ত খুঁজে পাবেন। উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্টাইল যে কেউ নিজের জীবনে প্রয়োগ করার পথরেখা পাবেন। রাসূল ﷺ-এর মতো নিখুঁত ও স্মার্ট হওয়া হয়তো অনেক কঠিন; এই বই আপনাকে অন্তত তার কাছাকাছি নিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। অসাধারণ এই বই 'বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ' নামে অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই মাসুদ শরীফ। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উত্তম জাযাহ দান করুন।

বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বইটি নিয়ে পাঠকদের আগ্রহ সত্যিই আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। স্যোশাল মিডিয়াতে এই বই নিয়ে কয়েকজন সম্মানিত আলেম সমালোচনা করেছেন, প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আমরা প্রত্যেকটি গঠনমূলক সমালোচনাকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান আলেমের সাথে আলোচনা করে ত্রুটিগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। যারা ভুলগুলো আন্তরিকতার সাথে ধরিয়ে দিয়েছেন,

তাদেরকে হৃদয়ের গহীন থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাব্বুল আলামিন এই প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমরা সচেতনভাবে কোনো ভুল তথ্য উপস্থাপন করতে চাইনি, চাই না। এরপরেও কেউ কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর করলে, আমরা সংশোধন করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে '*গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*' অত্যন্ত গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত। বইটি দ্বীনের মানদণ্ডে আপনার স্মার্টনেস বাড়াতে সামান্যতম সহায়ক হলেও আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

অনুবাদকের কথা

নিখাদ আত্মোন্নয়নমূলক বই। পশ্চিমে এ ধরনের বই প্রচুর। ওখানে এসব বইয়ের কাটতিও থাকে অনেক। বাংলায় সে তুলনায় এই ধরনের বই আঙুলের কড়িতে গোনা যাবে। পশ্চিমা সমাজের বাইরের মেকআপটা নিলেও, ভেতরের সৌন্দর্যটা নিতে বড়ো অনীহা আমাদের।

এধরনের বইগুলো শতভাগ প্র্যাকটিক্যাল বা বাস্তবসম্মত। কীভাবে কী করবেন, কীভাবে নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে উন্নত করবেন তা-ই হাতে-কলমে বলা।

পশ্চিমা বইগুলোতে এসব বলা থাকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গবেষণা এবং তাদের নিজস্ব আদর্শ ও পদ্ধতির আলোকে। কিন্তু এই বইয়ে পশ্চিমা গবেষণার সাথে অভূতপূর্ব মেলবন্ধন হয়েছে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের। আমার জানামতে এরকম বই এটাই প্রথম।

নবিজি ﷺ নবুওয়াত পেয়েছেন চল্লিশ বছর বয়সে। কিন্তু নবি হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়টা ছিল ওনার প্রস্তুতিকাল। এই দীর্ঘ সময় জুড়ে আল্লাহ নিজের হাতে গড়েছেন তাকে। আমি অনেককে দেখেছি, দীর্ঘকাল ইসলাম চর্চা করার পরও নবিজির আদলে নিজেকে পুরোপুরি সাজাতে পারছেন না। খাবারে লবণ কম হলে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া। বাচ্চাকাচ্চাদের সঙ্গে নির্দয় আচরণ। কাজের লোকের সঙ্গে অকথ্য ব্যবহার। বসের সামনে ব্যক্তিত্বহীন হুজুর হুজুর। অধীনস্থের ওপর জোর গলা। খাবারদাবারে নিয়ন্ত্রণ নেই। আচার-ব্যবহারে চলনে-বলনে মাধুর্য নেই। আমরা জানি, নবিজি ব্যক্তিজীবন থেকে সামাজিক জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিলেন পরাকাষ্ঠা। কিন্তু কোথাও বলা হয় না কীভাবে তিনি তা হলেন? দেখানো হয় না আমাদের সময়ে কীভাবে আমরা ওনার পথরেখা অনুসরণ করে স্মার্ট হব।

নবিজি ﷺ কী ছিলেন, তা সবাই কমবেশি জানি। কীভাবে সেই 'কী' হলেন তা জানতে এবং হতে- এই বই হবে আপনার প্রথম ধাপ।

মাত্র ৩ মাসের ব্যবধানে বইটির তৃতীয় সংস্করণ বের হতে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। সম্পূর্ণ নন-ফিকশন ধাঁচের হওয়ার পরও বইটি যে পাঠকমহলে এভাবে সাড়া ফেলেছে, সেটা বেশ অনুপ্রেরণার। আমার লেখক জীবন শুরুর অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিল দ্বীন সম্পর্কে যারা অতটা সচেতন নন, তাদের মাঝে দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। আল্লাহ তায়ালাকে অনেক ধন্যবাদ যে এ বইটির ব্যাপারে অনেক নন-প্র্যাকটিসিং ভাই-বোন আগ্রহ দেখিয়েছেন। দ্বীনের প্রতি তারা হয়তো ততটা সচেতন নন। হয়তো এই বই পড়ে তারা নবিজির জীবনকে জানতে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হবেন। ইসলামকে গৎবাঁধা ধর্মের বাইরে একটা সম্পূর্ণ জীবনবিধি হিসেবে নতুন করে ভাবতে শুরু করবেন। এক কথায় বইটির সাফল্য এখানেই।

মাসুদ শরীফ
masud.xen@gmail.com

লেখকের কথা

জীবনে যারা বিশেষ কিছু হতে চান, এই বইটি তাদের জন্য। বইটির পড়তে পড়তে রাসূল ﷺ-এর জীবনের এমন সব ঘটনা থাকবে, যেগুলো মানুষকে অনুপ্রেরণা দেবে দারুণভাবে। অবলীলায় তারা তাঁকে গ্রহণ করবেন অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে।

বইটিতে তাঁর নবি হওয়ার আগের জীবন বেশি গুরুত্ব পাবে। আমরা দেখব, শিশুকাল থেকে কীভাবে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছেন। টিনএজ বয়সের চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে মোকাবিলা করেছেন। তরুণ বয়সেই কীভাবে সমাজে নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

সাধারণত জীবনীগ্রন্থগুলোতে যেভাবে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয়, এখানে ইচ্ছে করেই সেগুলো সেভাবে বর্ণনা করা হয়নি। এই বইয়ে আমাদের ভাষা অনেকটা ঘরোয়া। অনেকটা সাদাসিধে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে যেসব জীবনী লেখা হয়, সেগুলোর বেশিরভাগে দুটো জিনিস হামেশা পাওয়া যায়; রাসূল ﷺ-এর ৪০ বছরের পরের জীবন আর পাঠকদের মধ্যে তাঁর ব্যাপারে সম্ভ্রম জাগানো।

কিন্তু এ ধরনের লেখনীতে তরুণ পাঠকেরা নিজেদের কমই খুঁজে পায়। বইগুলোতে তাঁকে এতটাই নিখুঁত পুরুষ হিসেবে তুলে ধরা হয় যে, অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করতে বেগ পেতে হয়। তরুণরা অনেক সময়ই তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ সংকটের সাথে রাসূল ﷺ-এর জীবনী মিলিয়ে নিতে পারে না।

অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুব স্পষ্ট করে বলেন–

> 'আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে ভালো ভালো উদাহরণ'। সূরা আহজাব : ২

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, রাসূল ﷺ-এর সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক যতটা কাছের হওয়া উচিত, ততটা হয় না।

শিশুরা কখনো কল্পনাও করতে পারে না, তাদের প্রিয় রাসূল ﷺ একসময় তাদের মতোই শিশু ছিলেন। তিনি খেলেছেন, দৌড়াদৌড়ি করেছেন। টিনএজাররা কখনো ভাবেই না যে, তারা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে দিন পার করছে, রাসূল ﷺ-কে ঠিক এমনই কিছু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে। আমাদের তরুণরা জানে না কীভাবে তিনি পরিবর্তনের সাথে খাপ খেয়ে নিয়েছেন, কীভাবে তিনি অচলাবস্থার নিরসন করেছেন।

এই বইয়ে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ, কৈশোরের মুহাম্মাদ ﷺ এবং নবুয়তের আগের যুবক মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেখবেন ইনশাআল্লাহ।

নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা প্রিয় নেতাকে জীবনের চেয়েও ভালোবাসি। কিন্তু আমরা তাঁকে এমন সম্ভ্রম জাগানিয়া নিখুঁত মানুষ হিসেবে তুলে ধরি যে, আমাদের সময়ে তাঁকে অনুসরণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা কেন যেন রাসূল ﷺ-কে কঠিন করে উপস্থাপন করতে চাই।

এই বইতে পাঠক তাঁর সম্পর্কে এক নতুন চিত্র পাবেন। তারা দেখবেন কীভাবে তিনি আমাদের মতোই, আমরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি, সেগুলোর মোকাবেলা করেছেন। সেগুলোর মোকাবিলায় তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করবেন।

পাঠক আরও খেয়াল করবেন যে, এখানে নিজের জীবন উন্নয়নের ধাপগুলোর বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চিরাচরিত বইগুলোর বর্ণনা ভঙ্গিতে অনেক সময় মনে হয়, আমরা কি আর তাঁর মতো হতে পারব? এ ধরনের হীনমন্যতা দূর করে বাস্তব পদক্ষেপ দেখিয়ে দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য।

পৃথিবীতে মানুষ যতটা নিখুঁত হতে পারে নিঃসন্দেহে রাসূল ﷺ তা-ই ছিলেন। কিন্তু এটা সত্য যে, তিনি ছিলেন মানুষ। মানুষ হিসেবে অনেক সংকট ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। এসব ইস্যুতে প্রিয় নবিজি আর আমাদের মাঝে দারুণ কিছু মিল আছে। আমরা সহজাত উপায়েই নবিজিকে অনুসরণ করতে পারি।

তাঁর ব্যাপারে আমি যেসব কাহিনি উল্লেখ করেছি, সেগুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণিত দলিল থেকে নিয়েছি। অন্যান্য কিছু বইয়েরও সাহায্য নিয়েছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

- আকরাম উমারি। আস-সিরাহ আন-নাবাউইয়াহ আস-সাহিহাহ (নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্ভরযোগ্য জীবনী)।
- মাহদি রিযকুল্লাহ আহমাদ, আস-সিরাহ আন-নাবাউইয়া ফি দাওউল-মাসাদির আল-আসলিয়াহ (আদি উৎসের আলোকে ইসলামের নবির জীবনী)।

আত্মোন্নয়নমূলক বিভিন্ন বইয়ের অনেক বিষয় আমি এখানে নিয়ে এসেছি। বিশেষ করে যেগুলো ইসলামের সাথে খাপ খায়, যেগুলো রাসূল ﷺ-এর জীবনে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে আছে সামাজিক বিচারবুদ্ধি, সৃষ্টিশীলতা, পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া, নেতৃত্ব বিকাশের মতো বিষয়গুলো।

চিরাচরিত জীবনীগ্রন্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইকে দেখাটা ঠিক হবে না। সত্যিকারার্থে এটা ওই শ্রেণিতে পড়ে না। আবার ঠিক আত্মোন্নয়নমূলক বইও না। আমি এই দুই ধরন মিলিয়ে এক অনন্য মিশেল তৈরি করতে চেষ্টা করেছি।

সূচীপত্র

মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিশুকাল **১৭**
মানসিক বিকাশ ১৭
ছয় বছরের নিচে বাচ্চারা ১৮
ভালোবাসার চাহিদা পূরণ ১৯
সন্তানের ওপর ভালোবাসার প্রভাব ২০
কীভাবে শিশুর মানসিক চাহিদা পূরণ করবেন ২০
সন্তানের জন্য বাঁচা ২১
কীভাবে নিজের সন্তানকে অগ্রাধিকার দেবেন ২১
বাচ্চার সাথে সময় কাটানোর মানে কী ২২
মরুশিক্ষা ২২
মরুজীবন ২৩
মরুভূমি থেকে নিয়ে আসা মূল্যবোধ ২৪
আত্মশৃঙ্খলার মূল্য ২৫
বাচ্চাকাচ্চাদের শৃঙ্খলা শেখাবেন কীভাবে ২৬
সামাজিক দক্ষতা শেখা ২৬
খেলাধুলার গুরুত্ব ২৭
ভাষা দক্ষতা ২৮
শিশুর ভাষা দক্ষতা কীভাবে বাড়াবেন ২৯
মায়ের মৃত্যু ২৯
কীভাবে মোকাবিলা করবেন ৩০
মা হারানোর পর ৩০
অপূর্ব বালক ৩১
বাচ্চাদের আত্মবিশ্বাস কীভাবে বাড়াবেন ৩২
নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শৈশব থেকে পাওয়া শিক্ষা ৩৩
মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার **৩৪**
বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ৩৪
বর্ধিত পরিবার ৩৫
রাসূল ﷺ-এর পরিবার ৩৬
কুসাই ৩৭

আবদু মানাফ ৩৭
হাশিম ৩৭
আবদুল মুত্তালিব ৩৭
জমজম আবিষ্কার ৪০
হস্তীবর্ষ ৪১
শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই করুন ৪৩
রাসূল ﷺ-এর পরিবারের নারী সদস্যা ৪৪
রাসূল ﷺ-এর মা-বাবা ৪৪
আমিনা ৪৪
আবদুল্লাহ ৪৫
পরিবারের সুব্যবহার ৪৬
সন্তানকে বর্ধিত পরিবারের সাথে জুড়বেন কীভাবে ৪৭
বর্ধিত পরিবারের বিকল্প ৪৭
রাসূল ﷺ-এর পরিবারের সদস্যগণদের থেকে শিক্ষা ৪৮

মুহাম্মাদ ﷺ-এর চারপাশ ৪৯
আপনার প্রভাব-বলয় বাড়ান ৪৯
নিজের পরিবেশকে ছাঁচ দেওয়া ৫০
মক্কা ৫১
সমাজ ৫২
নারী ৫৪
বিদেশিরা ৫৫
অর্থনীতি ৫৭
বাজার ৫৮
সুক উকাজ ৫৮
বাজারে রাসূল ﷺ ৫৯
প্রভাব বলয় ৬১
মূর্তিপূজা ৬১
আল্লাহর উপাসনাকারীরা ৬২
নিজের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ৬৩
প্রকৃতি বনাম পরিচর্যা ৬৩
রাসূল ﷺ-এর পরিবেশ থেকে আমাদের কী লাভ ৬৪

মুহাম্মাদ ﷺ-এর কৈশোর **৬৫**
আস্থাভাজন হোন ৬৫
টিনএজ ৬৬
ঘরে ভালোবাসা ও সম্মান ৬৭
কিশোরদের সমর্থন দরকার ৬৯
আপনি কীভাবে টিনএজদের ভালোবাসবেন ৬৯
সম্মান ৬৯
কিশোর রাসূল ﷺ-এর সাথে আবু তালিব ৭১
আপনার টিনএজের সাথে আপনার ব্যবহার ৭১
টিনএজ বয়সীদের কীভাবে সম্মান দেখাবেন ৭১
ঘরের বাইরে ৭২
পিয়ার প্রেশার ৭৩
বিবেক ৭৪
উদাহরণ দিয়ে প্যারেন্টিং ৭৫
কীভাবে টিনএজদের বিবেক গড়ে তুলবেন ৭৫
বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ৭৫
কাজ ৭৭
সফর ৭৯
রাসূল ﷺ-এর কিশোর বয়স থেকে ফায়দা..... ৮১
তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ **৮২**
সৃষ্টিশীল হোন ৮২
বাস্তব মডেল ৮৩
রাসূল ﷺ দেখতে কেমন ছিলেন ৮৫
রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিত্ব ৮৬
সৃজনশীলতা ৮৭
কীভাবে সৃজনশীল হবেন ৮৮
সংঘাত নিরসন ৮৯
কীভাবে সংঘাত নিরসন করবেন ৮৯
কাজ ৮৯
নিজের সমাজের সাথে মিশুন ৯০

বন্ধুবান্ধব ৯১
বন্ধু নির্বাচনের সময় যা খেয়াল রাখবেন ৯২
বিয়ে ও পরিবার ৯২
বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ৯৫
ধর্মচর্চা ৯৫
চিন্তাভাবনা ও ব্যস্ত জীবন ৯৬
নিজের জন্য সময় ৯৬
যুবক-তরুণ বয়সে রাসূল ﷺ-এর জীবন থেকে শিক্ষা ৯৮

চল্লিশের কোঠায় মুহাম্মাদ ﷺ ৯৯
পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া ৯৯
৪০ বছরে পরিবর্তন ১০১
আমর আস সুলামি (রা.) ১০৩
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ১০৪
মানুষ কীভাবে বদলায় ১০৫
পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া ১০৬
কুরআনে পরিবর্তন ১০৮
মক্কার সংখ্যাগরিষ্ঠরা এই পরিবর্তনকে কীভাবে দেখেছে ১০৯
মক্কাবাসী যেভাবে পরিবর্তনে বাধা দিয়েছে ১০৯
প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ১১০
নিরাপদ পরিবেশ ১১১
নিজের পরিস্থিতি বদলান ১১১
ইথিওপিয়া ১১২
দৃষ্টিভঙ্গি বদলান ১১৩
রাসূল ﷺ-এর জীবনের মূল ঘটনা ১১৩
দ্বন্দ্ব ১১৩
যোগাযোগের মাধ্যমে বদল ১১৪
পরিবর্তনের উপকরণ ১১৪
হিজরত ১১৫
নবিজির চল্লিশের কোঠার জীবন থেকে আমরা কী শিখতে পারি ১১৬

পঞ্চাশের কোঠায় রাসূল ﷺ ১১৭
নেতৃত্ব গুণ ১১৭
মদিনা ১১৮
যোগ্য নেতৃত্ব ১১৯
বাস্তব নেতৃত্বের ভিত্তি ১২০
মদিনাবাসী ১২১
সম্পর্ক বদল ১২১
পরিবর্তনের পথে ১২২
কীভাবে পরিবর্তনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন..... ১২২
নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ ১২৩
বাগড়া-বাঁধানো দল ১২৪
ভিন্নমতাবলম্বী লোকজন ১২৪
দ্বন্দ্ব নিরসন ১২৫
বদরের যুদ্ধ ১২৫
উহুদ পাহাড় ১২৬
নেতৃত্ব শিক্ষা (এক) ১২৭
পরিখার যুদ্ধ ১২৮
নেতৃত্ব শিক্ষা (দুই) ১২৯
অবরোধ ১৩০
শান্তি ১৩০
কীভাবে অন্যদের রাজি করাবেন..... ১৩১
অচলাবস্থা নিরসন ১৩২
প্রতিপক্ষকে কীভাবে বোঝাবেন ১৩৩
মক্কায় প্রবেশ ১৩৩
নিজের প্রভাব বাড়ান ১৩৩
নবি ﷺ জীবনের শেষ পর্যায় ১৩৪
রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বগুণ থেকে ফায়দা ১৩৫
রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকাল..... ১৩৬

আপনার মিশন শুরু ১৩৭
প্রান্তটীকা ১৩৯
বিবলিওগ্রাফি..... ১৪১

মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিশুকাল

সাধারণত বাচ্চাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে প্রথম ছয় বছরে। এ সময়টাতে তাদের যথেষ্ট ভালোবাসা আর মনোযোগ প্রয়োজন। 'কোয়ালিটি টাইম' বা মানসম্পন্ন সময় বলে আমরা একটা বিষয় জানি। আমাদের ব্যস্ত জীবন আর ক্রমাগত সব মনোযোগ বিঘ্ন করা বিষয়ের মাঝে শিশুদেরকে আরও বেশি সময় দিতে হবে। যত্ন নিতে হবে। বিধবা মা আমিনার আলিঙ্গন, চুমু আর মায়াভরা হাসির মধ্য দিয়ে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবেগী প্রয়োজনগুলো পূরণ হয়েছে। শিশুদের জন্য এমন আনন্দ-উত্তেজনাময় পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা জীবনের জরুরি দক্ষতা অর্জন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে সেটা ছিল মরুপ্রান্তর। আমাদের জন্য তা হতে পারে স্কুল, দিবা সেবাকেন্দ্র, রিডিং ক্লাব, আত্মীয়স্বজনের বাসা বা শিশুকেন্দ্রিক ফিটনেস সেন্টার।

মানসিক বিকাশ

ছয় বছর বয়স পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মায়ের সঙ্গে ছিলেন। মা মারা যাওয়ার পর প্রথমে দাদা আবদুল মুত্তালিব এবং পরে চাচা আবু তালিবের সাথে থাকেন। একটি শিশুর বেড়ে উঠার জন্য যে ধরনের আদর, ভালোবাসা ও যত্ন দরকার ছিল, তার সবই তিনি তাঁদের কাছে পেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, মরুভূমির কঠিন পরিবেশ তাঁকে দিয়েছে জীবনমুখী নানা দক্ষতা অর্জনের উৎসাহ।

শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে প্রথম ছয় বছরে। প্রথম বছরে শিশুর মধ্যে অনুভূতি জন্মলাভ করে। দ্বিতীয় বছর থেকে তার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। তৃতীয় বছরে বাচ্চারা অন্যের সাথে ভাববিনিময় করতে শেখে। চতুর্থ বছর থেকে ধীরে ধীরে তারা হয়ে উঠে আত্ম-নির্ভরশীল। পঞ্চম আর ষষ্ঠ বছরে তারা নিজেদের চাওয়া-পাওয়াগুলো তুলে ধরতে শেখে। এসময় নিজেদের আবেগ-অনুভূতিগুলো আরও ভালোভাবে প্রকাশ করতে শেখে। শিশুদের এই ছয় বছরের ব্যাপারগুলো একটি চার্টে আমরা দেখব।

প্রথম বছর	অনুভূতি জন্মলাভ করে।
দ্বিতীয় বছর	শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে।
তৃতীয় বছর	অন্যের সাথে ভাববিনিময় করতে শেখে।
চতুর্থ বছর	আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করে।
পঞ্চম বছর	চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরতে শেখে।
ষষ্ঠ বছর	চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরতে শেখে।

এই অধ্যায়ে আমরা ছয় বছর বয়স পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাল্যকালকে দেখব। তাঁকে বড়ো করতে যেয়ে তাঁর মা ও দুধ-মা কী বিশাল ভূমিকা রেখেছিলেন, তা দেখব। এরপর দেখব, তাঁর শিশুকালের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কীভাবে শিশুদের বড়ো করতে পারি।

ছয় বছরের নিচে বাচ্চারা

পরিবেশ আর ব্যক্তিত্ব ভেদে শিশুদের বেড়ে উঠার গতি কমবেশি হয়ে থাকে। সে হিসেবে বলতে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বয়সের তুলনায় একটু বেশিই বড়ো ছিলেন। তাঁর বয়স যখন দুবছরের নিচে, তখন তাঁর এনার্জি দেখে অনেকেই অবাক হতেন। তারপরও শিশুদের মাঝে এমন কিছু ব্যাপার থাকে যা মোটামুটি সবার জন্য এক। ছয় বছর পর্যন্ত একজন শিশুর বেড়ে উঠার ব্যাপারগুলো আমরা আরেকটি চার্টে দেখব।

ছয় মাস	শিশু তার মায়ের কণ্ঠ চিনতে পারে। পরিচিত চেহারা দেখে হেসে ওঠে।
নয় মাস	তাদের মধ্যে প্রথম কৌতূহলের ছাপ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে উদ্‌বেগও দেখা যায়।
এক বছর	চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখার ইচ্ছে জাগে। সাধারণ নির্দেশনাগুলো বুঝতে শেখে।
দুই বছর	প্রায় দুশো শব্দের মতো শব্দভান্ডার জমা হয়।
তিন বছর	এটা কেন, ওটা কেন- এমন প্রশ্ন করতেই থাকে। অন্যদের সাথে খেলাধুলা ও সাহায্যের মনোভাব গড়ে ওঠে। অন্যকে খুশি করতে চায়।
চার বছর	কিছুটা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। মজা করে। এক থেকে বিশ গুনতে শেখে।
পাঁচ বছর	শব্দভান্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়। সময়ের ব্যাপারে সজাগ হয়।
ষষ্ঠ বছর	কথাবার্তা বলায় আস্থাশীল হয় এবং কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পায়।

শিশুরা সাধারণত প্রথম পর্যায়গুলো মায়ের সাথে বেশি কাটায়। অনুভূতিসংক্রান্ত চাহিদাগুলো তিনিই পূরণ করেন। আর পরবর্তী পর্যায়গুলো সামাজিক আর ভাষাগত দক্ষতা অর্জনে কেটে যায়। আমরা দেখি যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জীবনেও এমনটা হয়েছে। অন্য আর দশটা শিশুর মতো তাঁর ওই সময়টাও কেটেছে একান্তে মায়ের সাথে।

ভালোবাসার চাহিদা পূরণ

বাবা মারা যাওয়ার পর পরিবারের আর্থিক দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন দাদা আবদুল মুত্তালিব। সংসার খরচের চিন্তা না-থাকায় মা আমিনা তাঁর পুরো সময়টা ছেলের পেছনে দিতে পেরেছিলেন। মা হিসেবে বাবা না থাকার কষ্ট কিছুটা হলেও পুষিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কখনো আদরঘন আলিঙ্গন, কখনো মমতামাখা চুমু, কখনো-বা শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে ভালোবাসার হাসি, এভাবেই তাঁকে আগলে রেখেছিলেন মা আমিনা। শিশুকালে রাসূল ﷺ তাঁর মায়ের সঙ্গে খুব বেশি একটা সময় কাটাতে পারেননি। অনেক শিশুরা এ বয়সে মায়ের সাথে অনেক সময় কাটায়।

কিন্তু তারপরও শিশু মুহাম্মাদ ﷺ যে ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছিলেন, সেটা আজকাল অনেক শিশুর ভাগ্যেই জোটে না।

আজকালকার মায়েরা অনেক বেশি ব্যস্ত। অনেক দায়িত্ব; ঘর সামলানো, চাকরি, স্বামীসেবা, অন্যান্য বাচ্চাদের দেখভাল ইত্যাদি। মা আমিনার কাঁধে এত বোঝা ছিল না। সংসার খরচের দায়ভার নিয়েছিলেন দাদা। কুঁড়ি বছর বয়সেই বিধবা আমিনাকে এসব নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। আমিনার সব ব্যস্ততা ছিল একমাত্র সন্তান মুহাম্মাদকে ঘিরে।

তখনকার সমাজে সন্তানের বেড়ে উঠায় বাবারাই মূল ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু পরিস্থিতির দাবি মেনে মা আমিনা তাঁর মাতৃসুলভ ভালোবাসা আর আদরের পুরোটাই একমাত্র সন্তান মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর ঢেলে দিয়েছিলেন।

সন্তানের ওপর ভালোবাসার প্রভাব

শিশুর মানসিক বিকাশে ভালোবাসা আর আদরের প্রভাব অনেক। এতে তার নিজের ব্যাপারে আস্থা জাগে, আত্মবিশ্বাস জন্মে। আবেগ-অনুভূতি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, এতে করে শিশুরা নিজেদের নিরাপদ মনে করে। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে। আপনিও আপনার বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরুন। ঘুম থেকে উঠার পর কিংবা বাইরে থেকে বাসায় এসে তাকে সালাম দিন। চুমু দিন। তার সাথে খেলুন। এগুলো ওর মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখবে। আত্মমর্যাদা বাড়াবে।

আপনার অবস্থা হয়তো এমন না যে, আপনি পারফেক্ট বাবা-মা হবেন। কিন্তু যতটুকু পারুন ওকে সময় দিন, আদর করুন। মনোযোগ দিন। মাঝেমধ্যে বা কেবল বিশেষ কোনো ঘটনায় ওর প্রতি আদর না-দেখিয়ে নিয়মিত দেখান।

কীভাবে শিশুর মানসিক চাহিদা পূরণ করবেন

- প্রতিদিন চুমু দিন, জড়িয়ে ধরুন।
- ওর কথা মন দিয়ে শুনুন। বাধা দেবেন না।
- বাসার বাইরে থাকলে ফোন দিয়ে কথা বলুন।
- ওর সাথে খেলুন। নিজের পোশাক ময়লা হওয়া নিয়ে চিন্তার দরকার নেই।
- ভালোবাসা দিয়ে দিন শুরু করুন। আর অখুশি হয়ে কখনো দিন শেষ করবেন না।[১]

সন্তানের জন্য বাঁচা

মা আমিনার স্বামী মারা যান ৫৭১ সালে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ। তারপরও তিনি কিন্তু আর বিয়ে করেননি। তখনকার সমাজ অবশ্য বিধবাদের খাটো চোখে দেখত না। যাদের বংশ ভালো ছিল, তাদেরকে উঁচু নজরে দেখত। আমিনার রূপ আর কবিতা আবৃত্তির গুণে চাইলেই

তিনি আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারতেন। সমাজ যে তাঁকে এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করেনি, তা কী করে বলি? কিন্তু তিনি বিধবাই থেকে গেলেন। সেই সমাজে বড়ো পরিবারের আলাদা মর্যাদা ছিল। আমিনার মনেও হয়তো অমন বড়ো পরিবারের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু তিনি হয়তো তাঁর ছেলে মুহাম্মাদের জন্য নিজেকে কোরবান করেছিলেন। শিশু মুহাম্মাদের জীবনকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে নিজের জীবনের সাথে আপস করেছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত মোটেও স্বাভাবিক ছিল না। ছিল প্রথাবিরোধী। বিশ বছর বয়সী এক বিধবা তরুণীর জন্য এই সিদ্ধান্ত যে অনেক কষ্টের ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

কীভাবে নিজের সন্তানকে অগ্রাধিকার দেবেন

শিক্ষাবিদরা শিশুদের জন্য আলাদা সময় রাখার গুরুত্বের কথা বলেন। যেন মনে হয়, শিশুদের সাথে সময় কাটানো একটা বোঝা। আনন্দের কিছু না। চাকরিজীবী মায়েরা তাদের সন্তানদের যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। এতে অনেক মা-ই মনে মনে এক ধরনের অপরাধবোধে ভোগেন। তাদের এই অপরাধবোধে প্রলেপ দেওয়ার জন্য 'আলাদা সময়' ধারণার জন্ম হয়। অথচ আলাদা সময়ের বদলে আমাদের তো শিশুদের সাথে এমনিতেই সময় কাটানোর কথা। আর সেটাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ঘড়ি ধরে কেন? কত সুন্দরভাবে সময় কাটাচ্ছি বিবেচনার সাথে সাথে কতক্ষণ সময় কাটাচ্ছি, সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ না। বাবা-মায়েরা সন্তানের সাথে যত বেশি সময় কাটাবে (এখানে 'বেশি' বলতে পরিমাণের কথা বলছি) তাদের সামাজিক, মানসিক ও একাডেমিক সমস্যা তত কম হবে। মাদকে জড়ানোর আশঙ্কা কমবে। বখাটেগিরি বা এ ধরনের কোনো অপরাধমূলক কাজ অথবা বিয়ের আগে বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে হারাম সম্পর্কে জড়ানোর প্রবণতা কমবে। লরা রামিরেজের কথায় এমনটাই পাওয়া যায়-

> 'বাচ্চাদের পার্কে নিয়ে যান। এটা ভালো। কিন্তু এটা কোনোভাবেই ভালো প্যারেন্টিং-এর বিকল্প নয়। বাবা-মা'কে তাদের বাচ্চার ছায়া হয়ে থাকতে হবে। এর মানে তাদের সাথে ভালো সময় কাটাতে হবে। ওদের সময়টা যখন ভালো যাবে না, তখন ওদের পাশে থাকতে হবে। ওদের প্রতিটা সমস্যায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।'[২]

বাচ্চার সাথে সময় কাটানোর মানে কী

- সময় কাটানো মানে এই না যে, সবসময় কিছু না কিছু করতেই হবে। ওদের সাথে থেকে ওরা কী করছে, না করছে তার ওপর নজর রাখাই যথেষ্ট।
- ওদেরকে সময় দেওয়া সংসারের দৈনন্দিন টুকিটাকি কাজের অংশ নয়। কাজেই ওদেরকে এমনভাবে সময় দেবেন না, যাতে ওদের মনে এই ধারণা উঁকি দেয়।
- যেকোনো সময় আপনার কাছে ঘেঁষতে ওদের মনে যেন কোনো ধরনের সংকোচ কাজ না করে।

মরু শিক্ষা

রাসূল ﷺ ছোটবেলায় শুধু মায়ের কাছ থেকেই শেখেননি। তাঁর দুধ-মা হালিমা এবং তাঁর পরিবার থেকেও মানসিক বিকাশের শিক্ষা নিয়েছেন। হালিমার আরও তিন সন্তান ছিল- আবদুল্লাহ, আনিসা, শায়মা। সাথে ছিল তাঁর স্বামী আল হারিস। মক্কা থেকে তাদের বাড়ির দূরত্ব ছিল ১৫০ কিলোমিটার। মাঝে মাঝেই এখান থেকে মক্কায় যাওয়া হতো তাঁর। প্রায় চার বছর তিনি এখানে কাটিয়েছেন। অনেক কিছু শিখেছেন এখান থেকে।

সে সময়কার আরব উপদ্বীপের মরুভূমি অঞ্চল সম্পর্কে জানলে সহজে বুঝতে পারব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাল্যকালে মরুভূমির ভূমিকা কেমন ছিল। কী কী মূল্যবোধ তিনি এখান থেকে শিখেছেন।

তখন স্কুল-কলেজ বলতে তেমন কিছুই ছিল না। মরুভূমির এক একটা পরিবারই ছিল এক ধরনের স্কুল। শহরের মা-বাবারা বাচ্চাদের চারিত্রিক বিকাশের জন্য, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যই মরুর এসব পরিবারে পাঠাতেন।

মূলত, গ্রামাঞ্চল ও মরুভূমির চেয়ে শহর অঞ্চলে অসুখ-বিসুখের মাত্রা ছিল তুলনামূলক বেশি। শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার। ইসলামের বার্তা পুনরায় চালু হওয়ার আগে থেকেই সেখানে হজের রীতি বহাল ছিল। হজের সময়ে স্বাভাবিক কারণে লোকজনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেত। যার কারণে নানা রকম রোগ বালাই-এর আশঙ্কাও বৃদ্ধি পেত। এসব কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সেসময় অধিকাংশ শহুরে পরিবারের বাচ্চাদের মরু অঞ্চলে পাঠানো হতো। তা ছাড়াও মরু অঞ্চলের কথ্য আরবি যেকোনো ধরনের বিকৃতি থেকে মুক্ত ছিল। মরুভূমির বেশিরভাগ নারীই পেশা হিসেবে বা পারিবারিক বন্ধন গড়ার খাতিরে শহরের বাচ্চাদের লালন-পালনের জন্য নিয়ে যেত। নতুন আর অজানাকে জানার, আবিষ্কারের পসরায় সজ্জিত ছিল মরুভূমির উন্মুক্ত বালুচর। শহরের দালানঘরে সেই সুযোগ কোথায়?

মরুভূমিতে থেকে থেকে শিশু মুহাম্মাদের সামাজিক আর যোগাযোগের দক্ষতা বেড়েছে। শারীরিক সামর্থ্য বেড়েছে। ভাষা শাণিত হয়েছে। সে সময়ের মরু-অঞ্চল, বাচ্চাদের এসব দিকগুলো বিকাশের জন্য দারুণ সহায়ক ছিল।

তবে আজকের জামানায় এসে আমি আপনার শিশুকে মরুভূমিতে পাঠাতে বলব না। কিন্তু যেসব পরিবেশ শিশুদেরকে উদ্দীপ্ত করবে, সেগুলোকে কখনোই উপেক্ষা করবেন না। এগুলো হতে পারে স্কুল, দিবাসেবা, আত্মীয়ের বাসা কিংবা এ ধরনের অন্য কিছু। খেয়াল রাখতে হবে, এই জায়গাগুলো যেন নিরাপদ হয় এবং শিশুর প্রতিভা বিকাশ ও আবিষ্কারে সহায়ক হয়।

নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শৈশব থেকে পাওয়া শিক্ষা

বিষয়	রাসূলের শৈশব	আপনার শিশুর
শৈশব আবেগ-অনুভূতি	শিশু মুহাম্মাদ ﷺ সবার ভালোবাসা পেয়েছিলেন। আদর-যত্ন পেয়েছিলেন। তাঁর ইমোশনাল প্রয়োজন পূরণে তাঁর মা বেশিরভাগ সময় দিয়েছেন।	আপনি আপনার সন্তানকে ভালোবাসুন। আদর করুন, যত্ন করুন। চুমু খান। জড়িয়ে ধরুন। তার প্রতি ভালোবাসার জানান দিন। এতে সে আপনার ভালোবাসা আরও গভীরভাবে অনুভব করবে। আর এভাবে তার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বিকশিত হবে।
বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা	মরুভূমি থেকে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ আত্মনিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা শিখেছিলেন। সেখানে খেলাধুলা, আনন্দ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ওখানে যা শিখেছিলেন পরিবারে এসে সেটা আরও জোরদার হয়েছে।	হুমকি-ধমকি বা শাস্তির ভয় ছাড়া আপনার শিশুর আচার-আচরণের উন্নতি হবে এমন পরিবেশ দিন। খেলাধুলার জন্য যথেষ্ট সময় দিন। কারণ, এভাবেই শিশুরা সবচেয়ে ভালো শেখে।
ভাষা দক্ষতা	মরুভূমিতে থাকার কারণে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ অনেকের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। এতে করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ ও যোগাযোগের দক্ষতা বেড়েছে।	বই পড়ার প্রতি আপনার সন্তানের মধ্যে ভালোবাসা জাগাতে সাহায্য করুন। তাকে গল্প বলুন। তার কথা মন দিয়ে শুনুন।
আত্মবিশ্বাস	শিশু মুহাম্মাদ ﷺ নিজের ব্যাপারে এবং নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সবসময় উৎসাহমূলক কথাবার্তা শুনেছেন।	আপনার শিশুর প্রতিভা খুঁজে বের করুন। তার সাথে ভালো ব্যবহার করুন। মাত্রাতিরিক্ত সমালোচনা করবেন না।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর চারপাশ

আশেপাশের পরিবেশ আমাদের প্রভাবিত করে। তবে সেটা পুরোপুরি আমাদের গড়ে দেয় না। কঠিন বা প্রতিকূল পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ করতে থাকলে কোনো কাজ হয় না; বরং সক্রিয়ভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। আমার সমাজ আমার পাশে না-দাঁড়ালে আমাদেরকেই রুখে দাঁড়াতে হবে। রাসূল ﷺ যখন কিশোর বা তরুণ, তখনো তিনি কিন্তু নবি হননি। তবে তাঁর মধ্যে একটা মজবুত বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি বিদ্যমান সুযোগগুলোকে কাজে লাগিয়েছিলেন। নিজেকে বিকশিত করেছিলেন। সমাজ যখন আমাদের ওপর চেপে আসবে, বেশিরভাগ লোকদের মনমানসিকতার সাথে মিশে যেতে জোরাজুরি করবে, তখন নিজেদের ও আশপাশের পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ খাটাতে হবে। আমাদের সুবিধায় ব্যবহার করতে হবে।

আপনার প্রভাব-বলয় বাড়ান

আগের অধ্যায়ে আমরা আট বছর পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর বাল্যকাল নিয়ে কথা বলেছি। তাঁর বেড়ে উঠায় তাঁর মা, দুধ-মা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অবদান নিয়ে কথা বলেছি। এখানে আমরা কথা বলব মক্কায় রাসূল ﷺ যে পরিবেশে মানুষ হয়েছেন সেই পরিবেশ, সেখানকার লোকজন আর সমাজের ব্যাপারে।

চোদ্দোশো বছর আগে রাসূল ﷺ কোনো-না-কোনো পরিবেশে বড়ো হয়েছেন, তাঁর সাথে আজকের জমানার লেনাদেনা কী? এমন প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। সময় তো এখন আর আগের মতো নেই। মূর্তি, উট কিংবা তলোয়ারের মতো বিষয়গুলো আধুনিক সমাজে অচল। আমরা এখানে সেই সময়ের মক্কার পরিবেশে খুব বেশি ভেতরে যাব না। তখনকার মানুষের মনমানসিকতা, চালচলন বোঝার জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমরা শুধু সেটুকুর ব্যাপারে কথা বলব।

রাসূল ﷺ যে পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, সে পরিবেশের অবস্থা ফুটিয়ে তোলা আমার উদ্দেশ্য। কারণ, কারও জীবন বুঝতে হলে এটা বোঝা জরুরি। আমি চাই, পাঠকরা যে পরিবেশে আছেন, তারা যেন সেটা নিয়েও ভাবেন। কীভাবে সেখানে নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন সেটা নিয়ে ভাবেন।

নিজের পরিবেশকে ছাঁচ দেওয়া

রাসূল ﷺ তাঁর জীবনের ৮৫ ভাগ সময় মক্কায় কাটিয়েছেন। ৬৩ বছরের মধ্যে ৫৩ বছর। বহু পরিবারে, বহু ঘরে, নানা পরিবেশে, নানা কাজে কাটিয়েছেন। বিয়ের পর তাঁর নিজের একটা পরিবার হয়। তাঁর বেশকিছু বন্ধুবান্ধবও ছিল।

প্রতিটা পরিবেশে এমন কিছু থাকে, যা সেখানকার মানুষের ওপর কোনো না কোনোভাবে প্রভাব ফেলে। তবে এখানে মজার বিষয় হচ্ছে, তখনকার পরিবেশে বড়ো হয়েও কীভাবে রাসূল ﷺ নিজেকে আলাদা করেছিলেন। অথচ সেই একই পরিবেশে বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিল।

মানুষ তার পরিবেশের ফল। তবে এর মানে এই না যে, এ কারণে তাকে তার নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র হারিয়ে ফেলতে হবে। আমরা দেখব, কীভাবে রাসূল ﷺ আশেপাশের মানুষের সাথে নিজের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ বজায় রেখে চলেছেন। যেসব কাজ শুধু পুরুষদের কাজ বলে বিবেচিত, সেগুলোতে তখনকার কিছু নারীরা বাধা ঠেলে জয় করেছিলেন, উজ্জ্বল হয়েছিলেন। সেগুলোও দেখব। দেখব আরবদের মধ্যে থেকেও কীভাবে অনেক অনারব নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিলেন। মূর্তিপূজারীদের শেকড় ছিল যেখানে, সেরকম প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও কীভাবে এক আল্লাহর দাসত্বকারীরা আলাদা হয়েছিলেন।

এরা সংখ্যায় কম ছিলেন। অনেকে এদের গোনায় ধরতেন না। কিন্তু সমাজের প্রচলিত আদর্শে তারা গা ভাসিয়ে দেননি। নিজের লোকজন বা সমাজের প্রতি অনুগত থেকেও কীভাবে নিজের বিবেক বিসর্জন দেবেন না, নিজের স্বাতন্ত্র ধরে রাখবেন এ ব্যাপারে এ অধ্যায় আপনাকে অনুপ্রেরণা দেবে।

অন্ধভাবে সমাজের রীতিনীতি গায়ে মাখবেন না। আপনি এ কাজটা কেন করেন, এ ধরনের কথা জিজ্ঞেস করলে দেখবেন বেশিরভাগ লোকই বলবে, 'লোকে করে, তাই করি'। বা 'এভাবেই চলে আসছে'। তারা এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না। আপনি এমন হবেন না। আপনার আদর্শ, আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে কোনটা খাপ খায়, সেভাবে ভেবে সিদ্ধান্ত নিন।
মক্কা আর মক্কার লোকজন দিয়ে শুরু করি।

মক্কা

মক্কার অবস্থান সাউদি আরাবিয়ার পশ্চিমে। মিসর থেকে সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত লোহিত সাগরজুড়ে এর অবস্থান। আয়তন প্রায় ৫শো বর্গকিলোমিটার। মক্কায় অনেক পাথুরে পাহাড় চোখে পড়ে। এগুলোর কোনো কোনোটার উচ্চতা ৬শো মিটার। প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের চেয়েও দ্বিগুণ। গরমকালে এখানে গড় তাপমাত্রা ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতকালে ২৫ ডিগ্রি।

রাসূল ﷺ যখন মক্কায় পুনরায় ইসলামি জীবনব্যবস্থা চালু করেন, তার অনেক আগে থেকেই কিন্তু কাবাঘরের কারণে মক্কা সুপরিচিত ছিল। স্থানীয়দের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তা আর স্থিতিশীলতা বিরাজ করত সব সময়। আপনি দেখবেন, অন্যান্য শহরগুলো তখন নিজেদের নিরাপত্তার জন্য চারিদিকে শক্ত প্রাচীর বানাত। দুর্গ নির্মাণ করত। সম্ভাব্য শত্রুর হামলা থেকে বাঁচার জন্য এ রকম আরও অন্যান্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি রাখত। কিন্তু মক্কার সুরক্ষায় এ রকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ঐতিহ্যগতভাবে এখানে লড়াই নিষিদ্ধ ছিল।

ইসলাম আসার আগে ওখানকার লোকজন বহু দেবদেবী, মূর্তির পূজা করত। এসব মূর্তির একটা করে ভাস্কর্য মক্কায় রাখা থাকত যাতে যুদ্ধবিরতি বজায় থাকে। প্রত্যেক অঞ্চলে বা গোষ্ঠীতে আলাদা আলাদা ঈশ্বর ছিল। যেমন তায়েফের লোকদের প্রধান দেবীর নাম ছিল লাত। মদিনার লোকেরা পূজা করত মানাতের।

মক্কায় প্রায় ৩৬০টি ভাস্কর্য বা মূর্তি ছিল। এগুলো ছিল আরবদের দেবদেবীর প্রতীক। তো এ কারণে কলহপ্রবণ গোত্রগুলো মক্কাকে পবিত্র শহর হিসেবে সম্মান করত।

বিশেষজ্ঞদের অনুমান ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে মক্কায় প্রায় বিশ হাজারের মতো লোকজনের বসতি ছিল। আশেপাশের এলাকা গোষ্ঠী অনুযায়ী বিভক্ত ছিল। যাদের পূর্বপুরুষ এক তারা সবাই এক গোষ্ঠীর সদস্য।

মক্কার প্রধান গোষ্ঠী ছিল কুরাইশ। রাসূল ﷺও এই গোষ্ঠীর। তাদের পূর্বপুরুষ নাযর। রাসূল ﷺ-এর জন্মের প্রায় ১২ প্রজন্ম আগের। কাবার আশেপাশেই তাদের ঘরদোর ছিল। তারা কাবার রক্ষণাবেক্ষণ করত। তীর্থযাত্রীদের দেখাশোনা করত।

রাসূল ﷺ-এর পরিবেশ থেকে আমাদের কী লাভ	
রাসূল ﷺ-এর পরিবেশ	**আপনার পরিবেশ**
তাঁর চারপাশে অনেক প্রলোভন ছিল। তবে ভালো কিছু বিকল্পও ছিল। যেমন : বাজারে কিস ইবনে সাদা'র মন নাড়িয়ে দেওয়া লেকচার।	নিজের চারপাশ নিয়ে অভিযোগ করবেন না। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে উপযোগী সুযোগ ও বিকল্প খুঁজুন। এরপর নিজেকে বিকশিত করুন।
বহু দেব-দেবীর পূজো করার জন্য সেই সমাজে বহু চাপ ছিল। কিন্তু তারপরও এক আল্লাহর উপাসনাকারীরা সেই চাপ প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন।	সমাজে সবাই কিছু একটা করছে, বা সেটাই প্রবল এই ভেবে সেগুলো অনুসরণ করতে যাবেন না। নিজের বিশ্বাস প্রত্যয় প্রকাশের চেষ্টা করুন।
রাসূল ﷺ-এর আরবসমাজে অনারবদের নিচু চোখে দেখা হতো। কিন্তু তারপরও কেউ কেউ তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার গুণে সফল হয়েছিলেন।	সংখ্যালঘু হলেও আপনি আপনার প্রতিভা ও দক্ষতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী থাকুন। দেখবেন যে এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠরা একদিন আপনাকে সম্মান করছে।
রাসূল ﷺ-এর আরবসমাজ প্রচণ্ড নারীবিরোধী ছিল। তারপরও কেউ কেউ বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন।	নিজের প্রতিভার প্রকাশ ঘটান। যদিও সমাজ আপনাকে যথেষ্ট সহযোগিতা না-করে বা উৎসাহ না দেয়।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর কৈশোর

টিনএজ বয়সটা বেশিরভাগের জন্য বিব্রতকর। এ বয়সের ছেলেমেয়েদেরকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। শৈশব থেকে কৈশোরে পা দেওয়াটা প্রাকৃতিক ব্যাপার হলেও বেশিরভাগের ক্ষেত্রে এই পদার্পণ মসৃণ হয় না। টিনএজ বয়সীদের সবকিছু নেতিবাচক না। তাদের ভালোভাবে দেখাশোনা করলে, তাদের ওপর আস্থা রাখলে, তাদের আচারআচরণও ভালো হবে। তারা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে। মায়ের মৃত্যুর পর রাসূল ﷺ ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত চাচার সাথে ছিলেন। চাচা তাঁকে ভালোবাসতেন। স্নেহ করতেন। এ বয়সে যদি তাদেরকে ঠিকমতো বড়ো করে তোলা হয়, তাহলে বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতেও তারা বিপথে যাবে না। দায়িত্বশীলভাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবে।

আস্থাভাজন হোন

অনেকের কাছে কৈশোরের বয়সটা বিব্রতকর। স্পর্শকাতর। এই অধ্যায়ের শিরোনাম দেখে কেউ কেউ ভ্রু কুঁচকাতে পারেন। রাসূল ﷺ-ও টিনএজ বয়স পার করেছেন!

যাহোক, শৈশব থেকে কৈশোরে পা দেওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এই ধাপ পার করেছেন। এটা নিয়ে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই।

টিনএজ বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানা রকম হরমোনজনিত পরিবর্তন দেখা দেয়। এর ফলে তার আচার-আচরণ, কথাবার্তায় পরিবর্তন আসে। সব পরিবর্তনই খারাপ না। পরিবর্তনগুলো তাদের আশপাশ ও ব্যক্তিত্ব থেকে উঠে আসে।

চ্যালেঞ্জটা কৈশোরের না। সে কোন পরিবেশে মানুষ হচ্ছে সেটা। স্বাভাবিকভাবে তারা অস্থির না; বরং খুব আবেগী। এজন্য বুদ্ধি করে তাদের সাথে চলতে হবে।

আগের অধ্যায়ে আমরা রাসূল ﷺ-এর পরিবারের বাড়তি সদস্যদের ভূমিকা দেখেছি। এখানে দেখব কিশোর বয়সে ঘরে বাইরে তাঁর জীবন প্রণালি কেমন ছিল। আমার লক্ষ্য টিনএজ বয়সীদের আত্মবিশ্বাস মজবুত করা। অন্যান্যরাও যেন বোঝেন যে, যেসব পরিবেশে ভালোবাসা আছে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক আছে, যেখানে কিশোরদের আগ্রহকে খাটো চোখে দেখা হয় না, সেখানে তারাও ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

টিনএজ

একেক সংস্কৃতিতে কিশোর বয়সের সংজ্ঞা আলাদা। এক দেশে যে বয়সে কাউকে কিশোর ধরা হয়, অন্য দেশে তা হয় না। কোথাও আগে, কোথাও পরে। এই অধ্যায়ে আমরা শুধু রাসূল ﷺ-এর কিশোর বয়স নিয়ে কথা বলব।

কোনো কোনো মুসলিম পাঠক হয়তো বলবেন, 'রাসূল ﷺ-কে তো আল্লাহ নিজে হেফাজত করেছেন। কিশোর বয়সের সমস্যাগুলো তাঁকে আমাদের মতো ফেস করতে হয়নি।'

রাসূল ﷺ-কে অবশ্যই মহান আল্লাহ সুরক্ষা করেছেন। তবে সেটা তাঁর মানবীয় গুণাবলির মধ্য থেকেই। আর মহান আল্লাহ এমন কিছু উপায়ে তা করেছেন, যা থেকে কিশোর ছেলেমেয়েদের বড়ো করার বেলায় যেকোনো বাবা-মা উপকৃত হতে পারেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা কাজ করেছেন মানুষদের মাধ্যমে। তারা ভালোবেসে টিনএজ রাসূল ﷺ-কে পালন করেছেন। এমন পরিবেশ দিয়েছেন যেখানে তিনি তাঁর কর্মশক্তির সুব্যবহার করতে পেরেছিলেন। আমরাও এমনটা করতে পারি।

রাসূল ﷺ খুব অসাধারণ জীবন কাটিয়েছেন। এমন কথা যেন আমাদের হতোদ্যম না-করে; বরং এটা যেন আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়। নইলে রাসূল ﷺ-এর কাহিনি মানুষের মনে শুধু সমীহ জাগাবে। ভক্তি বাড়াবে। কিন্তু নিজেদের উন্নতির জন্য কীভাবে তাঁর জীবনকে আমরা বাস্তব উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, তা উপলব্ধি করতে পারব না।

ঘরে ভালোবাসা ও সম্মান

চাচা আবু তালিবের ঘরে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল আটজন। আবু তালিব, তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আসাদ। তাদের সন্তান জাফর, জুমানা, ফাখিতা, আকিল, আলী ও তালিব। তাদের ঘরবাড়ির আকার, কতগুলো রুম ছিল, কেমন আসবাবপত্র ছিল- সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি। তবে ঐতিহাসিকগণ বলেন, তাদের পরিবারের হাল-হাকিকত খুব একটা ভালো ছিল না। আর্থিক সমস্যার কারণে পরিবারে মাঝে মাঝে বিবাদ হতো। তবে পরিবারের পরিবেশ স্থিতিশীল ছিল। কিশোর বয়সের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো ছিল। একে অপরের কদর করত।

এই সময়ে আল্লাহ তায়ালা কীভাবে তাঁকে সুরক্ষা করেছেন, সে ব্যাপারে তিনি বলেন–

> 'তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দেননি?' আদ দ্বোহা : ৬

আশ্রয় বলতে এখানে শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের কথা বলা হয়নি; বরং স্থিতিশীল পরিবার এবং যে পরিবার টিনএজদের ভালোবাসা ও সম্মানের প্রয়োজন মেটায় তার কথাও বলা হয়েছে।

অসংখ্য গবেষণায় পাওয়া গেছে, স্থিতিশীল পরিবারে বেড়ে উঠলে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো হয়। স্কুলে এদের পারফরম্যান্স ভালো হয়। ড্রাগ ব্যবহার বা আত্মহত্যার মতো সমস্যাগুলোতে পড়ার আশঙ্কা কম হয়।

স্থিতিশীলতা ও বোঝাপড়ার সাথে ভালোবাসা ও স্নেহও থাকতে হবে। রাসূল ﷺ তাঁর কিশোর বয়সে এর সবই পেয়েছিলেন।

আবু তালিব যে কিশোর মুহাম্মাদকে কতটা ভালোবাসতেন তার কিছু নমুনা দিই।

- সবাই একসাথে খাওয়ার আগে তাঁর জন্য অপেক্ষা করত।
- তাঁর কাছাকাছি ঘুমাতেন।
- সফরে বা কোথাও গেলে তাঁকে নিয়ে যেতেন।

যে ঘরে সাত সাতটা বাচ্চা থাকে, সে ঘর- হয় জান্নাত নয় জাহান্নাম। আবু তালিবের স্ত্রী ফাতিমা এক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। চিরায়ত জীবনীগ্রন্থগুলোতে তাঁর ব্যাপারে খুব একটা কথা পাওয়া যায় না। রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল তার কমই জানি। মা হিসেবে তিনি কিন্তু চমৎকার ছিলেন। রাসূল ﷺ তো এ ঘরে বড়ো হয়েছেনই, আলী আর জাফর (রা)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি ব্যক্তিত্বরাও কিন্তু এ ঘরেই মানুষ হয়েছেন। চাচির ব্যাপারে রাসূল একবার বলেছিলেন, 'চাচির পর চাচির মতো আর কেউ আমার প্রতি এত দরদি ছিলেন না।' খাদিজা (রা)-এর সাথে বিয়ে হওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূল ﷺ এ বাড়িতে ছিলেন। প্রায় সতেরো বছর। এ বাসা ছেড়ে দেওয়ার পরও চাচির সাথে তার সম্পর্ক কমেনি; বরং বেড়েছে।

আবু তালিবের মৃত্যুর পর চাচি ফাতিমা বিনতে আসাদ ইসলাম কবুল করেন। এরপর তাঁর ছেলে আলি ও বউমা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে চলে আসেন। ছোটো থাকতে রাসূল ﷺ-কে চাচি যেভাবে যত্নআত্তি করেছেন, নবিকন্যা ফাতিমা (রা)ও তাঁর শাশুড়িকে সেভাবে যত্নআত্তি করেছেন। দুজন ফাতিমার মধ্যে গুলিয়ে ফেলবেন না। ফাতিমা বিনতে আসাদ রাসূলের চাচি। আর ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ রাসূল ﷺ-এর কন্যা।

মদিনায় মৃত্যুর আগপর্যন্ত চাচির কাছাকাছি ছিলেন রাসূল ﷺ। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি নিজ হাতে তাঁর কবর খুঁড়েছেন তাঁর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে। তাঁর জন্য দুআ করেছেন।

আপনিও আপনার টিনএজ ছেলেমেয়েদের সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ুন, যে সম্পর্ক দিনদিন শুধু বাড়বেই।

কিশোরদের সমর্থন দরকার

কিশোরদের জন্য বয়সটা সঙ্কুল। তাই পরিবারের উচিত সবধরনের সহায়তা করা। আদর-যত্ন ভালোবাসা দেওয়া। এগুলো ম্যাজিকের মতো কাজ করে, কারণ–

- ওরা মানুষের আকর্ষণ চায়। মূল্যায়ন চায়। আপনি সেটা দিচ্ছেন।
- ওদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
- আত্মবিশ্বাসের সাথে ওরা দায়িত্ববান হয়।

প্রথমে মা, এরপর দাদি, তারপর চাচি- সবার কাছেই রাসূল ﷺ আদর ভালোবাসায় মানুষ হয়েছেন। বিনিময়ে তিনিও তাঁর চাচা-চাচির ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছেন। চাচাকে সাহায্যের জন্য তিনি রাখাল হিসেবে কাজ করেছেন। চাচার মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেই একই বছরে তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী খাদিজা (রা)ও মারা যান। সে বছরটা 'দুঃখের বছর' নামে পরিচিত।

আপনি কীভাবে টিনএজদের ভালোবাসবেন

- তার অর্জনগুলো উদ্‌যাপন করুন।
- তাকে বিচার না-করে বা বাধা না-দিয়ে তার কথা মন দিয়ে শুনুন।
- তাকে জানান যে, আপনি তাকে ভালোবাসেন, তার মূল্যায়ন করেন।

সম্মান

ভালোবাসার সাথে সম্মানও দরকার। রাসূল ﷺ-এর পরিবার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান করত। এটা তাঁর বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করেছে। যে কারণে তিনি ছোটো বয়স থেকেই দায়িত্বশীল আচরণ করেছেন। উনি কীভাবে দায়িত্বশীল আচরণ করেছেন, আর আপনি তা থেকে কী ফায়দা নিতে পারেন চলুন দেখি-

রাসূল ﷺ-এর ব্যবহার	আপনার আচরণ
রাসূল ﷺ তখন ১২ বছরের বালক। এক সন্ন্যাসী তাঁকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য শর্ত দিলেন লাত আর উয্যার কসম কাটতে। তিনি বললেন, 'লাত, উয্যার নামে আমাকে কিছু বলতে বলবেন না। আল্লাহর কসম, এদেরকে আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি। এখন আপনি আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন।'	সংখ্যায় বেশি হলেই কারও মত অনুসরণেরযোগ্য হয় না। রাসূল ﷺ-এর আশেপাশে বেশিরভাগই ছিল মূর্তিপূজারি। কিন্তু তিনি তা থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। সুতরাং ভদ্রভাবে এবং অন্যের মতের প্রতি সম্মান রেখে নিজের বিশ্বাস প্রকাশ করুন।
চাচা-চাচী, চাচাতো ভাইবোনদের সাথে বসে ধীরে-সুস্থে খাবার খেতেন। গোগ্রাসে গিলতেন না। খাওয়া শেষ করেই হুটহাট উঠে যেতেন না।	কোনো কিছু নিয়ে অধৈর্য হবেন না। পীড়াপীড়ি করবেন না। ধৈর্য ধরুন। কিছু চাইতে হলে সুন্দর করে সম্মান রেখে চান।
ঘুম থেকে উঠে ঘুমকাতুরে চোখ আর উশকো-খুশকো হয়ে তিনি বের হতেন না। অন্যান্যদের সাথে দেখা করার আগে চোখমুখ ধুতেন। চুল আঁচড়াতেন।	ঘরে পরিবারের ভেতরেও নিজের অ্যাপিয়ারেন্সের খেয়াল রাখুন।

কীভাবে টিনএজদের বিবেক গড়ে তুলবেন

- ভুল করে ফেললে সুন্দরভাবে বোঝান। তার অর্জনে নিজের গৌরব দেখান। কারণ, এটা তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবে।
- তার জন্য এমন বন্ধুবান্ধব খুঁজুন যারা ইসলামের আদর্শ বুকে ধারণ করে। তাহলে আপনার অনুপস্থিতিতে তারা তাকে পথ দেখাবে।
- অন্যরা পছন্দ করুক কী না করুক, তাকে তার আদর্শে অবিচল থাকতে শেখান। 'না' বলার সামর্থ্য গড়ে তুলুন।

রাসূল ﷺ-এর কিশোর বয়স থেকে ফায়দা	
রাসূল ﷺ-এর কৈশোর	আপনার কৈশোর
রাসূল ﷺ তাঁর চাচাকে সাহায্য করার জন্য রাখালের দায়িত্ব পালন করেছেন।	আপনার মা-বাবাকে সাহায্য করুন। এমনকী যদি তারা সরাসরি সাহায্য না-ও চায়।
রাসূল ﷺ তাড়াহুড়ো করে খেতেন না। বিশেষ করে যখন অনেকের সাথে বসে একসঙ্গে খেতেন।	কিছু চাওয়ার সময় ধৈর্য ধরুন, ভদ্র থাকুন। বন্ধুত্বপূর্ণ থাকুন।
রাসূল ﷺ সবসময় চুল আঁচড়ে রাখতেন। ছিমছাম থাকতেন।	আপনার সামগ্রিক বাহ্যিকরূপের খেয়াল রাখুন, এমনকী যদি বাসায় পরিবারের সাথে থাকেন তবুও।
আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সুরক্ষা করেছিলেন গায়েবি আওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে তাঁর কটিবস্ত্র পরতে বলে।	আপনার অভ্যন্তরীণ ভয়েস ও বিবেক আপনাকে বলে দিক কোনটা খারাপ কোনটা ভালো। আস্থাভাজন থাকুন। এমনকী যদি আপনি মা-বাবা বা অন্য জ্ঞানী কারও তত্ত্বাবধান থেকে দূরে থাকেন তবুও।
খারাপ পথে যাওয়া থেকে আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে নিরাপদ রেখেছিলেন। রাসূল ﷺ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।	আপনার বেলায় আল্লাহ হয়তো এমন প্রকাশ্য হবেন না। কাজেই আপনাকে তাঁর সুরক্ষার নিদর্শন খুঁজে নিতে হবে।
রাসূল ﷺ বাহিরা সন্ন্যাসীকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি মূর্তিপূজারীদের দেবদেবীর নামে কসম কাটবেন না।	কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠ বলেই অন্ধের মতো তাদের অনুকরণ করবেন না। নিজের বিশ্বাস ভদ্রোচিতভাবে জানিয়ে দিন।
রাসূল ﷺ সিরিয়ায় সফর করেছিলেন। সেই কাফেলায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে কমবয়স্ক।	নিজেকে নতুন রোমাঞ্চের সামনে উন্মোচিত করুন। যা দেখেন তা দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলিকে সমৃদ্ধ করুন।

তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ

কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েরা নানা রকম বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পাথেয় কুড়িয়ে নেয়। যারা তা করে তারা পরিণত বয়সে সেগুলো সমাজের সাথে শেয়ার করে।

রাসূল ﷺ তরুণ ও যুবক বয়সে তাঁর চাচার পরিবারকে সাহায্য করেছেন। নিজ শহরের বিভিন্ন সংঘাত সমাধানে সামাজিক দক্ষতা ও সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়েছেন। সামাজিকভাবে তিনি সক্রিয় ছিলেন। তাঁর বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল। এরপরও মাঝে মাঝে তিনি একান্ত নিজের জন্য সময় বের করে নিতেন এবং তাতে কোনোরকম একাকী বা একঘেয়ে বোধ করতেন না। প্রযুক্তি আর সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম নিয়ে বেশিরভাগ তরুণ ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মাঝেও সমাজে সক্রিয় থাকার উপায় খুঁজতে হবে। নিজের জন্যও সময় খুঁজে নিতে হবে। ব্যালেন্সটা জরুরি।

সৃষ্টিশীল হোন

গত অধ্যায়ে আমরা কিশোর রাসূল ﷺ-কে দেখেছি। কীভাবে তিনি চ্যালেঞ্জে মোকাবিলা করেছেন, তাঁর এনার্জিকে প্রোডাক্টিভ উপায়ে ব্যবহার করে কাজ ও সফর থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেগুলো দেখেছি।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব ২০ ও ৩০-এর কোঠার রাসূল ﷺ-কে। যে বয়সে একজন তার লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজসেবা করতে পারে।

রাসূল ﷺ মক্কায় 'উদীয়মান তারকা'-তে পরিণত হন। সমস্যা সমাধানে তাঁর দক্ষতার কারণে মানুষের নজর কেড়েছিলেন। কাবাঘর নির্মাণ নিয়ে কুরাইশদের মধ্যকার বিতণ্ডা নিরসনে তিনি চমৎকার এক সমাধান বের করে দেন।

ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি সততার খ্যাতি অর্জন করেন। গ্রাহকদের আস্থা কুড়ান। সে সময়ের মক্কার এক শ্রদ্ধাভাজন ব্যবসায়ী নারী খাদিজার শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁরা দুজনে পরে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ঘরে ছিল চার মেয়ে, দুই ছেলে।

বাস্তব মডেল

পরিণত বয়সের রাসূল ﷺ-এর যে দিকটা সবচেয়ে অনুপ্রেরণা জোগায় তা হচ্ছে, কিশোর বয়স থেকেই দায়িত্ব গ্রহণের মানসিকতা। চাচার পরিবারকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি রাখাল হিসেবে কাজ করেছেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সিরিয়ায় গিয়েছেন। মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলেছেন। ইফেক্টিভলি ডিল করেছেন। কিন্তু তাই বলে অন্যকে খুশি করার জন্য নিজের আদর্শে ছাড় দেননি। তরুণ বয়সে তাঁর মধ্যে এই গুণগুলো স্বাভাবিক ছিল। কেউ কেউ ভাবেন, রাসূল ﷺ মনুষ্য ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু কথাটা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যেতে পারে। যেমন : সেই একই লোক হয়তো কুরআনের এই আয়াত উদ্ধৃত করবেন–

> 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই চমৎকার উদাহরণ আছে।'
> আয যুখরুফ : ৭৩

কিন্তু সেই তিনিই হয়তো মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলবেন, রাসূল ﷺ বলে অমুক অমুক কাজ করতে পেরেছেন। আমরা কি আর পারব?

গভীর ও নিখাদ শ্রদ্ধার কারণে কোনো কোনো মুসলিম ভাবেন তাদের আর তাঁর জীবনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। রাসূল ﷺ-এর কাহিনি শুধু সমীহ জাগানোর জন্য। এতে কি কোনো বাস্তব উদাহরণ নেই, যা থেকে আমরা আরও ভালো মানুষে পরিণত হতে পারি? আমরা তাঁর জীবনী পড়ি, তাঁর প্রতি ভক্তি জাগে। কিন্তু নিজের জীবনে কীভাবে তাঁর জীবনদৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে পারি, সেটা দেখি না।

চ্যালেঞ্জটা এখানেই। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ধরে রেখে কীভাবে তাঁকে আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অনুপ্রেরণা হিসেবে প্রয়োগ করব।

বিষয়টা এভাবে দেখুন, একজন মানুষ তার মনুষ্য ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে যত সেরা হতে পারেন, রাসূল ﷺ ছিলেন তা-ই। আমাদের কাজ হলো কত ভালোভাবে আমরা এখন তাকে অনুসরণ করতে পারি, সেই পথ খোঁজা।

এতদিন পর্যন্ত আপনি কী করলেন আর রাসূল ﷺ তাঁর এক জীবনে কী করেছেন, তার মধ্যে বিস্তর ফারাক। সাধারণ চোখে দেখলে এতে আপনি হতাশ হয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু বিষয়টাকে এভাবে না-দেখে মোটিভেশন হিসেবে নিন। রাসূল ﷺ যা করেছেন আপনি কখনো তাঁর কাছাকাছি যেতে পারবেন না, এমনটা ভেবে কখনো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন না।

নবি হওয়ার আগেও কিন্তু তিনি অসাধারণ মানুষ ছিলেন। কুরআন তাঁকে বর্ণনা করছে, 'নৈতিক চরিত্রের পরাকাষ্ঠা হিসেবে'। আল ক্বলাম : ৪

এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখনও তিনি কিন্তু মক্কাতেই ছিলেন। বিষয়টা এমন না যে, এই আয়াত অবতীর্ণের পর তাঁর চরিত্র এক রাতের মধ্যে বদলে গেছে; বরং বছরের পর বছর ধরেই তাঁর চরিত্র এমন ছিল। কাজেই আমরা বলতে পারি, নবি হওয়ার আগেই তিনি নীতিবাগিশ ছিলেন। নবি হওয়ার পর সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

খাদিজা (রা)-কে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছিলেন, তিনি তাঁকে ভালোবাসেন তাঁর দয়া, সততা ও সত্যবাদিতার জন্য। তখন কিন্তু তিনি নবি ছিলেন না।

তরুণ বয়সে রাসূল ﷺ কেমন ছিলেন, সেটা বোঝার জন্য আমরা তার শারীরিক অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে শুরু করব। কারণ, একজন ব্যক্তির অ্যাপিয়ারেন্স সাধারণত শৈশবে বদলায়। আর তরুণ বয়সে মুখমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমরা তাঁর মুখ ও চালচলন দিয়ে শুরু করব। কারণ, এ দুটো কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে প্রথম আমাদের নজর কাড়ে।

রাসূল ﷺ দেখতে কেমন ছিলেন?

নির্ভরযোগ্য উৎসগুলো থেকে রাসূল ﷺ-কে যেমন পাওয়া যায়-

তাঁর মুখ ছিল কিছুটা গোলাকৃতির। দীপ্ত সুন্দর চেহারা। লালাভ ফর্সা গায়ের রং। মুখে কোনো দাগ ছিল না। মসৃণ। কালো বড়ো চোখ। বড়ো চোখের পাতা। সাদা দাঁত। কণ্ঠ ছিল নরম। ঠান্ডায় অনেকের গলা যেমন হয়। তবে অনেকের স্বাভাবিক কণ্ঠও এরকম হয়। চুলগুলো মাঝারি। তা কাঁধ স্পর্শ করেনি। আবার খুব ছোটোও ছিল না। তিনি যখন চুল কাটতে দেরি করতেন, তখন তা কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছাত। যখন তিনি তা কাটতেন, তিনি কান পর্যন্ত কাটতেন অথবা কানের লতি পর্যন্ত।

তাঁর উচ্চতা ও গড়ন ছিল মাঝারি। প্রশস্ত কাঁধ। পেটানো শরীর। পেশিবহুল না; তবে যথেষ্ট ভারী হাত, মোটা আঙুল। পা ও অন্যান্য অঙ্গগুলো সোজা ও লম্বা। পায়ের পাতার বাইরের বাঁকানো অংশটা মাটিতে লাগত না।

তাঁর হাঁটার মধ্যে একটা কর্মচঞ্চলতা ছিল। সতেজ ভাব ছিল। মাটির সাথে পা ঘেঁষে ঘেঁষে চলতেন না। তাড়া না-থাকলে ধীরস্থিরভাবে হাঁটতেন। শান্তভাবে কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন, যেন কোনো ঢালু বেয়ে নামছেন।

তাঁর চলাফেরা ছিল দ্রুত। কারও দিকে ফিরলে পুরো শরীর ঘুরিয়ে ফিরতেন। শুধু মাথা ঘোরাতেন না। তাঁর ঘাম ছিল মুক্তোর মতো, এত স্বচ্ছ ছিল সেগুলো। কস্তুরি ও অম্বরের চেয়ে তাঁর গায়ের ঘ্রাণ সুন্দর ছিল।

বাহ্যিক রূপ জেনে কী হবে? বইয়ের প্রচ্ছদ দেখে তো আর বোঝা যায় না বইটা কেমন। কাজেই নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাহ্যিক রূপ জানার প্রয়োজন কী?

রাসূল ﷺ-এর কিছু কিছু ব্যাপার মহান আল্লাহর তরফ থেকে উপহার। তবে কিছু আছে যা রাসূল ﷺ-এর বাহ্যরূপ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আপনি আপনার জীবনে কাজে লাগাতে পারেন।

তাঁর দাঁতগুলোর মধ্যকার স্বাভাবিক যে ফাঁক ছিল, আপনার হয়তো তেমন না; কিন্তু দাঁতের যত্ন ও সেগুলো সাদা ও পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে আপনি নজর দিতে পারেন। আপনার গায়ের স্বাভাবিক ঘ্রাণ হয়তো কস্তুরির মতো না, যেমনটা রাসূল ﷺ-এর ছিল (আর এটা কেবল তাঁর বেলাতেই ইউনিক ছিল), কিন্তু আপনি নিয়মিত গোসল করতে পারেন। হাত-পা ধুয়ে রাখতে পারেন। আরও যেসব দিক আপনি খেয়াল রাখতে পারেন–

রাসূল ﷺ-এর বাহ্যিকরূপ	**আপনার বাহ্যিকরূপ**
রাসূল ﷺ-এর চুল পরিপাটি ছিল।	আপনি চুল আঁচড়ান।
রাসূল ﷺ মোটাসোটা ছিলেন না।	শরীরচর্চা করুন। স্বাস্থ্যকর খাবার খান।
তাঁর দাঁত সাদা ছিল।	ক্যাভিটি ও হলুদ হয়ে যাওয়া থেকে নিজের দাঁতকে রক্ষা করুন।

বিষয়গুলো নতুন কিছু না। কিন্তু এগুলো মানুষ খুব সহজেই ভুলে যায়। যেমন : ফ্লসিং ও হালকা ব্যায়াম।

কীভাবে সৃজনশীল হবেন

- প্রতিটি বিষয়ের মাঝে নতুন সংযোগ খুঁজুন।
- যা শিখেছেন তা যদি আর না-চলে তাহলে তা রেখে দিন। নতুন কিছু শিখতে তৈরি থাকুন।
- দেখা সাক্ষাতের মাধ্যমে নিজেকে অন্যান্য উদ্ভাবকদের কাতারে রাখুন। তাদের অর্জনগুলো শিখুন।

কীভাবে সংঘাত নিরসন করবেন

- **সহযোগিতা :** এমন সমাধান দিতে হবে যা সবাই মেনে নেয় (যেমন : কাবাঘরে কালো পাথর রাখা নিয়ে রাসূল ﷺ যে সমাধান দিয়েছিলেন)।
- **ছাড় দেওয়া :** মীমাংসায় পৌঁছানোর জন্য সব পক্ষকে কিছু না কিছু ছাড় দেওয়াতে রাজি করাতে হবে।
- **পারস্পরিক অর্জন :** কোনোকিছুতে যে লাভ হবে– এটা আপনি যেভাবে বুঝেছেন বা দেখেছেন সেভাবে অন্যদেরকে বুঝিয়ে আশ্বস্ত করুন।
- **স্বীকার করা :** হাতের সমস্যাটা উপেক্ষা করবেন না বা ফেলে রাখবেন না। খুব তুচ্ছ বা সামান্য বিতণ্ডা হলে ভিন্ন কথা।

কর্মক্ষেত্রে, পরিবারে সংঘাত নিরসন এখন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতায় পরিণত হয়েছে। যুদ্ধের মানবিক ও অর্থনৈতিক খরচ অনেক অনেক বেশি। কিন্ত মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়। কাজেই অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে যেসব লোক সংঘাত নিরসনে দক্ষ তাদের কদর আজ অনেক।

চল্লিশের কোঠায় মুহাম্মাদ ﷺ

আমাদের জীবন অনেক দ্রুত বদলায়। পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অভিযোজ্যতা আমাদের মনমানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যবান স্বভাব। পরিবর্তনের যে গুরুত্ব আছে তা কিন্তু বেশিরভাগ লোকই বোঝে। কিন্তু বদলাতে পারে না। তারা ভয় পায় আরামের জায়গা ছেড়ে অনিশ্চয়তাময় পুরোপুরি নতুন ও অপরিচিত জায়গাকে। চল্লিশে পৌঁছে রাসূল ﷺ বড়োসড়ো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যান। যেটা বদলে দিয়েছে তাঁর, তাঁর বন্ধুবান্ধব ও সমাজের জীবন। এই সময়টাতে তিনি একাধারে প্রত্যাদেশ বা অহি পেতে থাকেন। মক্কা ছেড়ে মদিনায় বসতি গড়েন। পরিবর্তন একটা প্রক্রিয়া। কোনো ঘটনা না। এতে প্রয়োজন ধৈর্য, নিবেদন ও চর্চা।

পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া

রাসূল ﷺ-এর শিশুকাল ছিল মানসিক বিকাশ ও আবেগ ভালোবাসার। কৈশোরে তিনি তাঁর প্রাণশক্তি ব্যবহার করেছেন অভিজ্ঞতা অর্জনে। যুবক বয়সে তিনি তাঁর সেসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন সমাজসেবায়। ৪০ বছর বয়সে তিনি বড়োসড়ো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যান। অপ্রত্যাশিত ঘটনা সামলাতে শেখেন।

এই অধ্যায়ে আমরা প্রায়ই ‘পরিবর্তন’ বা ‘বদল’ শব্দদুটো দেখব। কারণ, এ সময়টাতে তিনি নিজে তো বটেই; পরিবার, বন্ধুবান্ধব অনেকের পরিবর্তন দেখেছেন।

এই অধ্যায়ে আমরা কথা বলব, চল্লিশের কোঠার রাসূল ﷺ-এর জীবন নিয়ে। সেইসঙ্গে যারা তাঁর পাশে ছিলেন, তাদের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনিগুলোও বলব।

পরিবর্তন সহজ না। এজন্য প্রশিক্ষণ দরকার। এই অধ্যায়ের আরেকটি মূলশব্দ ‘পরিবর্তন’। কেউ কেউ পরিবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্বকে খাটো করে দেখেন। মনে করেন, তথ্য শুষে নিলেই বুঝি আপনাআপনি মানুষ বদলে যায়; বরং এজন্য প্রয়োজন যেকোনো পরিবর্তনের পর নতুন সময়ের সাথে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য নিজের আচরণকে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

এই অধ্যায়ে আমরা আরও দেখব, কোন কোন কারণগুলো মানুষকে পরিবর্তনের জন্য তাড়া দেয়। বিশেষভাবে দেখব সেইসব প্রভাব সৃষ্টি করা পরিস্থিতিগুলো, যেগুলো মানুষের মাঝে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। রাসূল ﷺ-এর ডাকে বদলে যাওয়া অনেক মানুষের কাহিনি শুনব। আমরা পরিবর্তনের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলব। সেইসাথে পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী বদলে যাওয়া,

অকেজো অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া এবং যেটা বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করতে পারে, সেগুলো নিয়েও কথা বলব।

আমরা আরও দেখব, মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের আয়াতগুলোতে প্রথম দিকের কনভার্টেড মুসলিমদের পরিবর্তনের ধারা ও কার্যকারণ। কেমন করে এ আয়াতগুলো তাদের হৃদয় নাড়িয়ে দিয়েছিল? না-বদলানো মূর্তিপূজারীদেও কথাও শুনব। কেনই-বা তারা বদলাতে চায়নি, তাও জানব। কেন সাধারণভাবে বেশিরভাগ লোক বদলে যেতে ভয় পায়, বা বদলানোর চিন্তাকে বাতিল করে দেয়? আমাদের কিছু অভ্যাস, পরিবেশ নিজেদের বদলানোর পথে বড়ো বাধা। প্রয়োজনে এসব অভ্যাস আর পরিবেশও ছেড়ে দিতে হয়। রাসূল ﷺ কেন মক্কা ছেড়ে মদিনায় গেলেন? আসুন জেনে নিই।

৪০ বছরে পরিবর্তন

চল্লিশ বছর বয়সকে মানুষের জীবনের পালাবদলের সময় ধরা হয়। এ বয়সের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন,

> ‘যখন সে বলিষ্ঠ হয়, চল্লিশ বছরে পৌঁছে তখন বলে, “প্রভু, আমাকে, আমার বাবা-মাকে যে-অনুগ্রহ দিয়েছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করার সামর্থ্য দিন।” সূরা আহকাফ : ১৫

৪০ বছর বয়সে হওয়া রাসূল ﷺ-এর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন শুরু করব। পর্বত গুহায় রাসূল ﷺ চিন্তামগ্ন। হঠাৎ করে অভূতপূর্ব একটা ব্যাপার ঘটে গেল। মহান আল্লাহর এক বার্তাবাহক (ফেরেশতা) তাঁর সামনে এসে বললেন, ‘পড়ো’! রাসূল ﷺ ভীষণ ভয় পেলেন। তিনি বারবার বলছিলেন, তিনি পড়তে জানেন না। আতঙ্কে তাঁর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। ফেরেশতা তাঁকে খপ করে ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি দিলেন। আবার বললেন, ‘পড়’! রাসূল ﷺ-এর সামনে পড়ার মতো কিছুই ছিল না যদিও। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী পড়ব’? ফেরেশতা আবার তাঁকে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, ‘পড়ো’! রাসূল ﷺ আবারও বললেন যে তিনি অক্ষরজ্ঞানহীন। পড়তে জানেন না। ফেরেশতা শেষবারের মতো তাঁকে ঝাঁকি দিলেন। এবার এত জোরে ঝাঁকি দিলেন যে, তাঁর মনে হলো আত্মা বুঝি দেহ থেকে বের হয়ে যাবে। তিনি আবার বললেন, ‘পড়ো তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন’। সূরা আল আ’লাক : ১

ফেরেশতা জিবরাইলের সাথে রাসূল ﷺ-এর এই ঘটনার পর তাঁর জীবনমান আমূল বদলে গিয়েছিল। পর্বত গুহায় রাসূল ﷺ-কে শারীরিকভাবে যন্ত্রণাময় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ফেরেশতা জিবরাইল তাঁকে কঠিনভাবে চেপে ধরেছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি তাকে আবার দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। লম্বা সময় ধরে তিনি যদি না-আসতেন তাহলে চিন্তিত হয়ে পড়তেন।

পরিবর্তন আমাদের সবার জন্য প্রচণ্ড কঠিন বা যন্ত্রণাময় হতে পারে। কারণ, এটা একজন মানুষকে আরামের জায়গা থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে অপরিচিত জায়গায় নিয়ে যায়। কিন্তু একবার যখন সে নতুন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়, তখন আর ব্যথা থাকে না। মানুষ আসলে পরিবর্তন নিয়ে দোনোমনো করে না, তারা আসলে পরিবর্তনের সাথে আসা কষ্টকে ভয় পায়।

আপনাকেও কষ্ট সহ্য করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। দিনশেষে এগিয়ে থাকার জন্য মূল্য দিতে হবে। বড়ো কোনো পরিবর্তন ফ্রি ফ্রি আসে না।

রাসূল ﷺ খুব দ্রুত সাতজন মানুষের জীবন বদলে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা) (৫৫ বছর), তাঁর কন্যা জাইনাব (রা), রুকাইয়া (রা) ও উম্মে কুলসুম (রা); তাঁর চাচাতো ভাই আলি ইবনে আবু তালিব (রা) (১০ বছর); সে সময়ে তাঁর পালকপুত্র (পালকপুত্রে বিধান পরে বাতিল হয়ে যায়) যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) (৩০ বছর); তাঁর বন্ধু আবু বকর (রা) (৩৮ বছর)।

আবু বকর (রা) আরও পাঁচজন লোককে বদলে দিয়েছিলেন। উসমান ইবনে আফফান (রা) (৩৪ বছর), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) (৩০ বছর), তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) (১৯ বছর), আয জুবাইর ইবনে আল আওয়াম (রা) (১৬ বছর)।

মজার বিষয় হচ্ছে, এই লোকগুলোর মধ্যে পরিবর্তন এত দ্রুত কীভাবে হলো? সাধারণভাবে মানুষের মাঝে আইডিয়াগুলোই- বা কীভাবে ছড়ায়?

লিডারশিপ ও ম্যানেজমেন্ট থিউরিতে 'কানেক্টর' নামে একটা কথা আছে। এরা জানেন কীভাবে মানুষের সাথে লিংক করতে হয়। এরা একজন থেকে আরেকজনে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনামূলক আইডিয়া নিয়ে যায়। আজকের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো ঠিক যেভাবে করে। এ ধরনের লোকদের মাধ্যমে আইডিয়া সফলভাবে ছড়ায়।

আবু বকর আস সিদ্দিক (রা) এখানে একজন কানেক্টর। তিনি বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। যেমন সা'দ (রা) ছিলেন টিনএজ বয়সী। অন্যদিকে উসমান (রা)-এর বয়স ছিল ৩৪।

পরিবর্তনের আইডিয়াতে যারা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, দ্রুতই তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৩ থেকে ২০। এরপর ৩০। প্রথম দিকের ইসলামি ইতিহাসবিদ ইবনে হিশাম এমনটাই বর্ণনা করেছেন।

আমরা এখন এমন কিছু লোকদের ব্যাপারে জানব, যারা তাদের জীবন বদলে ফেলেছিলেন (এ ক্ষেত্রে ইসলামে ফিরে এসেছিলেন)। আপনারা যারা নিজেদের জীবন বদলাতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই অভিজ্ঞতাগুলো নতুন কিছু দিতে পারে।

আমরা বিশেষ করে তাদের দিকে নজর দেবো, যারা নিজেদের পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের কাহিনি জানব, যাতে আমাদের বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতে পারি।

নবিজির চল্লিশের কোঠার জীবন থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

(নোট : এখানে ৪০ মানে আক্ষরিক অর্থে চল্লিশ না। আমি আসলে জীবনের একটা পর্যায় বোঝাচ্ছি। যে বয়সটাতে মানুষ পরিণত মনের অধিকারী হয়। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিভেদে এটা একেক বয়স হতে পারে)

রাসূল ﷺ তাঁর চল্লিশে	পরিণত বয়সে আপনি
জিবরাইল ফেরেশতা যখন তাঁকে চেপে ধরেছিল তখন তিনি প্রচণ্ড যন্ত্রণা পেয়েছিলেন, কিন্তু তবু তিনি বারবার তাঁকে দেখতে চেয়েছেন। লম্বা সময় ধরে তাঁর দেখা না-পেলে তাঁর মন খারাপ হতো।	পরিবর্তনের জ্বালা সহ্য করুন। কারণ, এটা আগুনের পরীক্ষা যা আপনাকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবে।
রাসূল ﷺ নিজেকে ও তাঁর বন্ধুদের আল আরকামের বাড়িতে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য।	একবিংশ শতাব্দীতে টিকে থাকতে হলে আপনাকে শিখতে হবে। তবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হলে শিখতে হবে, প্রশিক্ষণ নিতে হবে, চর্চা করতে হবে।
রাসূল ﷺ মক্কা ছেড়ে মদিনায় বসতি গড়ে তাঁর পরিবেশ বদলে ফেলেছিলেন।	আপনার পরিবেশ যদি আপনাকে টেনে ধরে রাখে, তাহলে পরিবেশ বদলান। সেটা হতে পারে জায়গা অথবা অবস্থা।

পঞ্চাশের কোঠায় মুহাম্মাদ ﷺ

সফল পরিবর্তনের জন্য দরকার সফল নেতৃত্ব। সফল নেতৃত্ব মানে লোকেরা আগে যা চায়নি, তা চাওয়ার স্পৃহা জাগিয়ে তোলা এবং পাওয়ার ব্যবস্থা করা। নেতৃত্ব মানে লোকেরা যখন মনে করেছে কিছু পারবে না, তখন তাদের দিয়ে তা করানো। একজন নেতা ঝুঁকি নেন, সুযোগ খোঁজেন। তিনি এমন কিছু দেন যাতে মানুষ বিশ্বাস করে, অর্জনের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। রাসূল ﷺ যখন মদিনায় আসেন, তখন শহর জিনিসটার নতুন সংজ্ঞা দেন। নতুন সম্পর্ক গড়েন, বিশ্বাসের জন্য মানুষকে নতুন দর্শন দেন। নেতা হওয়া যদিও সহজাত গুণ, তবে এটা শেখাও যায়। প্রয়োগ করা যায়। এমনকী অপেক্ষাকৃত হালকা পর্যায়ের দায়িত্বের বেলাতেও।

কীভাবে পরিবর্তনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন

- প্রথমে পরিবর্তনের চাহিদা তৈরি করুন। আপনার লোকজনদের সাধারণত ৭৫ ভাগকে পরিবর্তনের গুরুত্বের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে হবে।

মদিনার জনগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে লাগাতার মারামারির কারণে শান্তিতে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা চেপে ধরেছিল। তাই তারা রাসূল ﷺ-এর সংস্কার নিয়ে খুশি ছিল কারণ, তারা নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো হা করে ছিল।

- পরিবর্তন নিয়ে আপনার রূপরেখা পরিষ্কারভাবে বলুন। কোনো অসঙ্গতি যেন না-থাকে। তাহলে লোকজন বুঝবে আপনি আসলে কী চান। তারা নিজের চোখে সব দেখতে পারবে।

নিরাপদ ও ভবিষ্যৎ মদিনার ব্যাপারে রাসূল ﷺ তাঁর কথা স্পষ্ট করে বলেছেন, 'মদিনাকে আমি হারাম করলাম যেভাবে নবি ইবরাহিম (আ) মক্কাকে হারাম করেছিলেন।' এ কথা শোনামাত্র সবাই নিজেদের শহরকে মক্কার মতো নিরাপদ কল্পনা করতে পেরেছিলেন।

- পরিবর্তনের ব্যাপরে যারা আশ্বস্ত তাদের নিয়ে কাজ করুন। এদের মধ্যে থাকতে পারেন উচ্চপদস্থ অফিসিয়াল ও অন্যান্য প্রভাবশালী লোক।

বদর যুদ্ধে কুরাইশদের চ্যালেঞ্জ করতে যারা তাঁর পরিকল্পনাকে মজবুত করবে রাসূল ﷺ তাদের সমর্থন খুঁজেছেন। সা'দ ইবন্ মু'আজের মতো গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী প্রধানদের কাছে পেয়েছিলেন।

নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ

একজন নেতাকে সবসময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন- কঠিন সময়, ঝামেলা পাকানো লোকজন অথবা যারা পরিবর্তনের ঘোরবিরোধী এমন লোকজন।

মদিনায় রাসূল ﷺ দু ধরনের লোকদের থেকে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। এদের একদল আমার ভাষায় বাগড়া-বাঁধানো ধরনের লোক। যারা তাদের স্বার্থে ঝুঁকি খুঁজে পেয়েছিল। দ্বিতীয় দল শক্তভাবে ভিন্নমতাবলম্বী, যারা কায়নুকার ইহুদি গোত্রের সাথে মিলিত হয়েছিল। এখন আমরা দেখব, দুটো দলের সাথে রাসূল ﷺ কীভাবে তাঁর নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ সামলেছিলেন।

আমি চাই, এখান থেকে আপনিও আপনার বিরোধীদের সাথে মোকাবিলায় শক্তি পান। চলুন বিরোধীদের মোকাবিলার পরিকল্পনার রসদ খুঁজি।

বাগড়া বাঁধানো দল

কেউ কেউ রাসূল ﷺ যেসব পরিবর্তন আনতে চাচ্ছিলেন তাতে বাধা দিয়েছিল। তিনি তাদের স্বার্থের জন্য হুমকি ছিলেন। আবার যে অবস্থায় তারা অভ্যস্ত ছিল তার প্রতিও রাসূল ﷺ-এর পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তারা রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঝামেলা পাকানো, অস্থিরতা তৈরি এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নড়বড়ে করে দেওয়ার হীন উদ্দেশ্যে 'আদ দিরার' নামে ভিন্ন একটি মসজিদ বানায়। তাদের কোনো নির্দিষ্ট গোত্র বা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল না। এটা ছিল পরিবর্তনের ঘোরবিরোধী লোকদের জোট। আল্লাহ তায়ালা এদেরকে 'মুনাফিক' বলেছেন।

তারা সংখ্যায় মোট কত ছিলেন আমরা জানি না। কিংবা তারা কোন জনগোষ্ঠীর অংশ ছিলেন কি না তাও জানা যায় না। তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। বদর যুদ্ধে মুসলিমগণের জয়ের পর তিনি অনিচ্ছাবশে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের মোকাবিলার জন্য রাসূল ﷺ তাদের ব্যক্তিত্ব এবং সমস্যার ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন কৌশল খাঁটিয়েছিলেন। কখনো তাদের সাথে সংলাপে বসতেন। কখনো কাউকে উপেক্ষা করতেন। আবার কখনো কখনো কাউকে কাউকে মদিনা থেকে বের করে দিতেন।

অচলাবস্থা নিরসন

শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা রাজি হলো যে, তারা হজ করতে পারবে তবে এ বছর না। আগামী বছর। দশকব্যাপী শত্রুতা এভাবেই শেষ হলো।

মুসলিমদের কাছে এই চুক্তি অবশ্য অন্যায্য মনে হয়েছিল। কারণ, তারা উমরার সব প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল। দেরি হোক এমনটা তারা চাননি। তা ছাড়া চুক্তিতে আরেকটা কথা ছিল যে, যারা মক্কা ছেড়ে আসবে তাদেরকে মুসলিমরা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ যদি মদিনা ছেড়ে আসে, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দিতে কুরাইশরা বাধ্য থাকবে না।

যাহোক, শেষমেষ তারা চুক্তির শর্ত মেনে নেয়। কারণ, রাসূল ﷺ একে তাদের বৃহৎ স্বার্থের জন্য দেখেছেন। বিষয়টাকে তিনি শুধু অন্য আদল থেকে দেখেননি; বরং প্রথমে যারা চুক্তিটাকে অন্যায্য ভেবেছিল তাদেরকেও তিনি তা বোঝাতে পেরেছিলেন। রাসূল ﷺ কীভাবে হুদায়বিয়ার শান্তিচুক্তির ফায়দা অন্যান্য মুসলিমদের বুঝালেন? আপনি কীভাবে অন্যদের সহজে বোঝাতে পারবেন?

প্রতিপক্ষকে কীভাবে বোঝাবেন

- **শুনুন :** ব্যালডোনি তাঁর *ইন্সপায়ার হোয়াট গ্রেট লিডারস* ডু বইতে দেখিয়েছেন যে, লোকজনদেরকে তাদের ভিন্নমত বলতে দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।
  'এটা কেবল ভিন্নমত দেওয়ার বিষয় না; বরং সত্যিকার অর্থে ভিন্নমত স্বীকার করা।'
  ব্যালডোনি, ১০৮-১০৯
  কোনো ধরনের বাধা, তিরস্কার বা রায় দেওয়া ছাড়া রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিগণকে তাদের হতাশা প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন।
- **লাগতে যাবেন না :** জোরাজোরি না করে যুক্তি, প্রমাণ ব্যবহার করে রাজি করানোর মাধ্যমে বোঝান। রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিগণকে বললেন, কুরবানি করতে। মাথা চেছে ফেলতে। তারা যখন করলেন না, তখন তিনি নিজেই শুরু করলেন। বাকিরা পরে তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলো। তিনি তাদের মন বদলে দিয়েছিলেন প্ররোচনার মাধ্যমে। নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি জোরাজোরি না করে।

নিজের প্রভাব বাড়ান

আপনার জীবনে দুটো অংশ আছে। যাদের ওপর আপনার প্রভাব আছে। আর যাদের নিয়ে আপনি উদ্‌বিগ্ন। যাদের ওপর আপনার প্রভাব আছে সেগুলো হচ্ছে- যা আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। অন্যদিকে, উদ্‌বিগ্নের বলয় হচ্ছে- যেসব জিনিস আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এর নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে নেই।[৯]

চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আপনার প্রভাব বলয় বাড়ানো, যাতে এটা উদ্‌বিগ্ন বলয়ে পৌঁছায়। রাসূল ﷺ তাঁর প্রভাব বলয় বাড়িয়েছিলেন হিজাযের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে মিত্রতা স্থাপন করে। যেটা পরে তাঁর উদ্‌বিগ্ন বলয়ে (মক্কা) প্রভাব ফেলেছিল কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার মাধ্যমে।

মক্কায় হজ পালনের পর এক সহিংসতার কারণে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে যায়। কুরাইশ সমর্থিত এক গোষ্ঠী মুসলিমদের সাথে মিত্রতা স্থাপনকারী এক গোষ্ঠীর ওপর হামলা করে। এর পেছনে সামরিকভাবে মদদ দিয়েছিল কুরাইশরা। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী তা ছিল নিষিদ্ধ। কুরাইশরা এ ঘটনার জন্য দুঃখজ্ঞাপন করে, কিন্তু রাসূল ﷺ কোনোভাবেই নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে এমন ঘটনা আর ঘটবে না। তাই তিনি তাদের সেই দুঃখপ্রকাশ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ১০ হাজার সৈন্য জড়ো করেন সামরিক অভিযানের জন্য।

মক্কার বাইরে মুসলিমদের এই বিশাল বাহিনী দেখে কুরাইশরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। রাসূল ﷺ পুরো শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। যদিও সেই সময়ের আরব উপদ্বীপের রীতি অনুযায়ী সব পুরুষদের হত্যা এবং নারীদের দাসী বানানোর পুরো অধিকার তাঁর ছিল।

রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকাল

জীবনের শেষ দিনগুলোতে রাসূল ﷺ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি তখন বসে বসে সালাত পড়তে শুরু করেন। অন্যের সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারতেন না। রাসূল ﷺ-এর চাচা হজরত আব্বাস رضي الله عنه তাঁর তীব্র জ্বর ও ক্রমাগত মাথাব্যথা নিয়ে বলেছেন, 'আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা যখন মারা যায়, তখন তাদের চেহারা কেমন হয় আমি জানি।'

মসজিদে শেষ ভাষণে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, তাঁর দিন ফুরিয়ে আসছে। কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে সেজন্য তিনি ক্ষমা চান।

> 'আমি যদি কারও পেছনে আঘাত করি, তাহলে সেটা আমার নিজের পেছনেই করেছি। কারও সম্পত্তি নিয়ে থাকলে সেটা নিজের সম্পদই অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছি। কারও সম্মান নষ্ট করলে আমারই করেছি।'

অসাধারণ অনুপ্রেরণামূলক জীবন কাটিয়ে ৬৩ বছর বয়সে রাসূল ﷺ তাঁর পরম বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

আপনার মিশন শুরু

আমরা বইয়ের একদম শেষে চলে এসেছি। আপনার মিশন এখন শুরু হতে যাচ্ছে।

অসাধারণ আর স্মার্ট হওয়া নির্দিষ্ট কোনো দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত না। কারণ সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। দক্ষতার প্রয়োজনীয়তাও বদলে যাচ্ছে। এই বইতে প্রাথমিক পর্যায়ের যেসব দক্ষতার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর বেলাতেও এটা খাটে। যেমন আবেগময় বুদ্ধিবৃত্তি, শেখার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, নিজের প্রভাব, বিশ্বাসযোগ্যতা, উদ্ভাবনী কৌশল বাড়ানো ইত্যাদি। নেতৃত্বের বিষয়টাই প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে।

দক্ষতাগুলো নিয়ে অলস বসে থাকা আপনার মিশন না; বরং অর্জন করার জন্য বা আরও বিকশিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে সেগুলো চর্চা করা এবং যুগের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নিজের দক্ষতাগুলো হালনাগাদ করা আপনার মিশন। এজন্য দুটো জিনিস দরকার-

- 'বিকশিত' শব্দটা বলতে যা যা বোঝায় করুন। ট্রেনিং সেশনে অংশগ্রহণ করুন, আত্মোন্নয়নমূলক বই পড়ুন, অনুপ্রেরণাদায়ী লোকজনদের সাথে মিশুন, যারা আপনাকে সমর্থন করে তাদের নিয়ে আপনার বলয় তৈরি করুন।
- রাসূল ﷺ-এর জীবন নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যান। কীভাবে নিজেকে বিকশিত করবেন, অন্যান্যদের সাথে রাসূল ﷺ-এর কথাবার্তা, চালচলন কেমন ছিল, সেসব লাইফ স্কিলগুলো জানুন।

আপনি যদি ধার্মিক মুসলিম হন এবং বলেন যে, আপনি এরই মধ্যে রাসূল ﷺ-এর চিরায়ত জীবনী কয়েকবার পড়েছেন, তাহলে আপনি রাসূল ﷺ-এর জীবনী পড়ে আর নতুন কিছু পাবেন না। শুধু ঘটনা জানার জন্য বলে থাকলে আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু যদি একই ঘটনা অন্য আলোয় পড়তে চান, জানতে চান, তাহলে একটা সিরাহ গ্রন্থ বা জীবনী বই পড়া মোটেও যথেষ্ট না। আপনাকে লাগাতার পড়ে যেতে হবে ভিন্নভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, কারণ প্রত্যেক যুগ রাসূল ﷺ-এর জীবনী সেই যুগের চাহিদা ও সমস্যার আলোকে লিখবে।

আশা করি, এই বই ইতিহাস ও আধুনিক জীবনের অনুপ্রেরণাদায়ী বিভিন্ন উদাহরণ পড়ার ক্ষুধা বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ধরনের অনেক ঘটনাই পাওয়া যাবে আশেপাশে। আর কে জানে, হয়তো পরের প্রজন্মের জন্য আপনি নিজেই হয়ে উঠবেন সেরকম একজন!

নবিজির ﷺ মতো হওয়া কি খুব সহজ?

রাতে এসে যখন শুনলেন ঘরে খাবার নেই, তখন তিনি নফল সিয়ামের নিয়্যাত করে ফেললেন। আমরা হলে কী করতাম?

প্রথম কয়েক বছর মানুষের কাছ থেকে বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও কীসের বলে নিরলস দীন প্রচার করে গেছেন? কীভাবে অর্জন করলেন অটল মনোবল?

কীভাবে রপ্ত করলেন এক অসম্ভব সুন্দর ভাষা, যা শুনলেই মানুষের হৃদয়ে ছাপ ফেলে দিত?

কেমন ছিল তাঁর শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য আর যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলো?

নবিজির ﷺ জীবনী পড়তে গেলে আমরা সাধারণত তাঁর নবুওয়্যাত পরবর্তী জীবনেই বেশি গুরুত্ব দিই। কিন্তু এর ভিত্তিটা যে মহান আল্লাহ তাঁর নবুওয়্যাত-পূর্ব ৪০ বছরের জীবনে ধীরে ধীরে তৈরি করেছিলেন সেটা কজন ঘেঁটে দেখি?

প্রচলিত অর্থে কোনো সীরাহ বই নয় এটি। কোনো তাত্ত্বিক ঘটনার বিবরণও না। এখানে আপনি পাবেন ব্যবহারিক কিছু জ্ঞান। হাতে কলমে শিখবেন নিজের বাচ্চাকে নবিজির ﷺ মতো করে বড় করার উপায়। টিনএজ বয়সী হলে জানতে পারবেন এই উড়ুউড়ু সময়টাতে নিজেকে বাগে রাখার কৌশল। বিবাহিত হলে আছে দুজনে মিলে জীবনটাকে আরও মধুর করার টোটকা। সর্বোপরি নবিজির ﷺ মতো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 'স্মার্ট' হওয়ার তরিকা।

তবে চলুন স্মার্ট হই প্রিয় নবিজির ﷺ মতো...

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০।
www.facebook.com/guardianpubs

ISBN-978-984-92959-5-2